দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কানঢাকা টুপি আর আমাদের সুশীল সমাজ
—পৃঃ ১২

আমাদের বুদ্ধিদাতারা : সেকাল একাল
—পৃঃ ১৯

৬৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ১৫ মে ২০১৭।। ৩১ বৈশাখ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

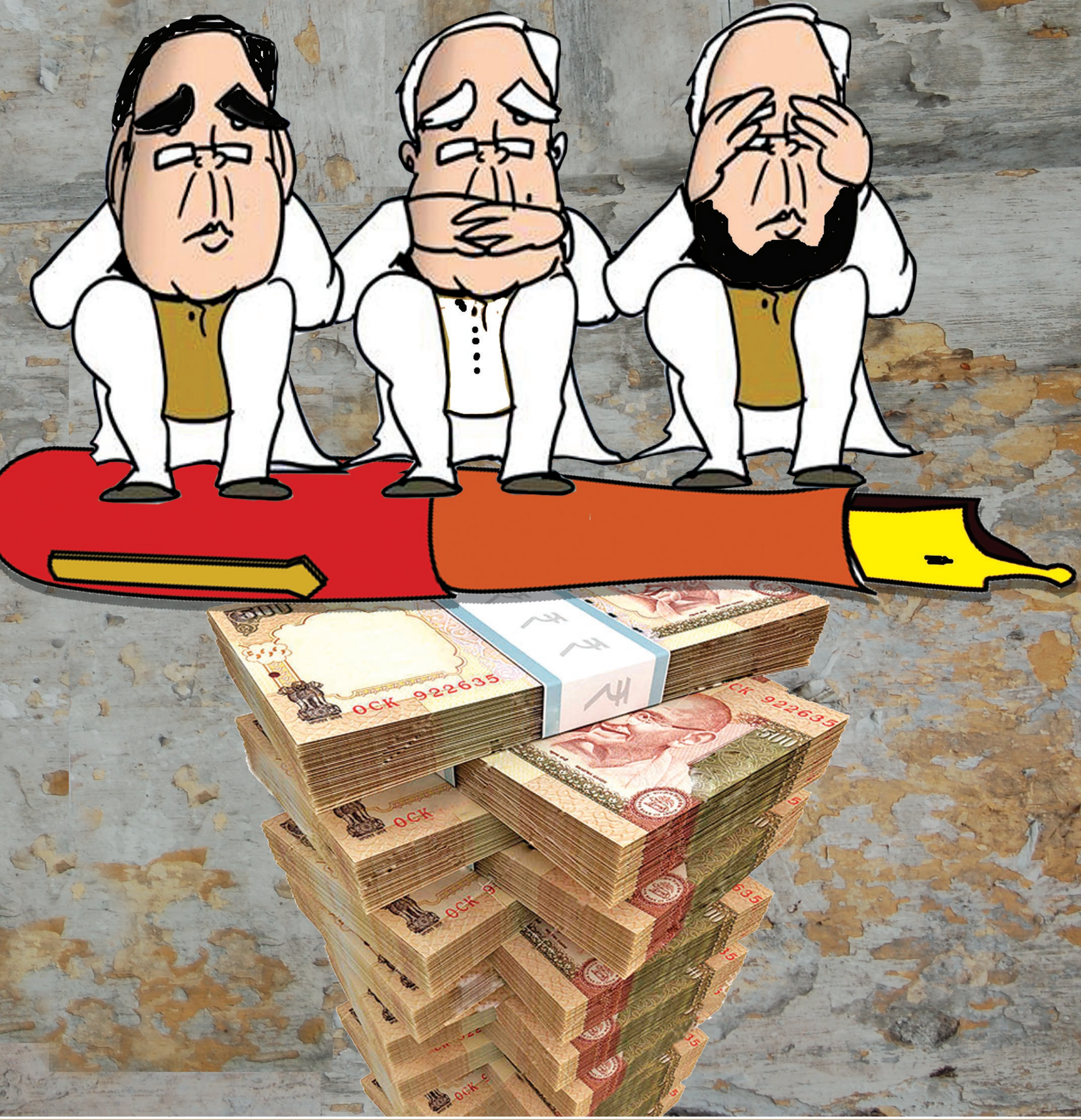

এই সময় ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৫ মে - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

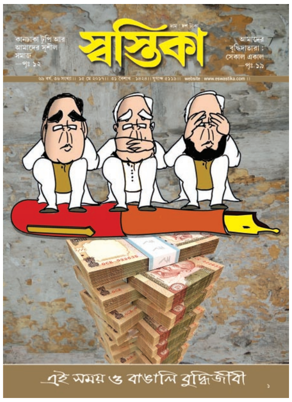

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

ক্ষমতাধরেরা মনে রাখবেন, ‘বল আছে দুর্বলেরও’
□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : ‘সততা’ তুতো দিদি আর ভাই কেমন আছেন?
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

কানঢাকা টুপি আর আমাদের সুশীল সমাজ
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

পাকিস্তানি বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা প্রয়োজন
□ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ) □ ১৪

তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আত্মহননের পথ মসৃণ করছেন
□ কুণাল চট্টোপাধ্যায় □ ১৬

আওয়ামি লিগ এবং বি এন পি দুই-ই এখন সংখ্যালঘুদের কাছে শঙ্কার কারণ □ ১৭

কাশ্মীরে অস্থিরতা দূর করতে বাহিনীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন □ অরুণ সাহানী □ ২৭

সারদা / সরস্বতী শিশুমন্দিরের উপর রাজ্য সরকারের রক্তচক্ষু
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ৩০

ভারতের নাথ সম্প্রদায় □ নির্মলেন্দু চক্রবর্তী □ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত
□ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □
সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ **রঙ্গম : ৩৭** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □
সমাবেশ সমাচার : ৪১-৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মাওবাদী সন্ত্রাস : আর কত রক্ত ঝরবে?

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ মাওবাদী সন্ত্রাসকে দেশের প্রধান অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে উল্লেখ করলেও তার সমাধান যে এখনও হয়নি তার প্রমাণ ছত্তিশগড়ের সুকমা-য় মাওবাদীদের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো এই সমস্যা নিয়ে আগামী সংখ্যায় আলোকপাত করবেন মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিলম্বিত বিচার

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় বড়সড় ধাক্কা খাইলেন লালুপ্রসাদ যাদব। এই রায়ের মাত্র কয়েকদিন আগে জেলবন্দি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথনের রেকর্ডিং প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা বাড়িয়াছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও অমিতাভ রায়কে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়াছে, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দেওঘর ট্রেজারি হইতে ৯৬ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে লালুপ্রসাদ যাদবের পৃথকভাবে বিচার হইবে এবং এই মামলা শেষ করিতে হইবে ৯ মাসের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে মোট ছয়টি মামলা দায়ের করিয়াছিল সিবিআই। চাইবাসা ট্রেজারির একটি তছরুপ মামলায় ইতিমধ্যেই তিনি জেল খাটিয়াছেন। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়াছিল, একই অভিযোগে আর মামলা হইবে না। সিবিআই এই রায়ের বিরোধিতা করিয়া সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় খারিজ করিয়া পৃথকভাবে বিচারের নির্দেশ দিয়াছে। লালুপ্রসাদের পক্ষে ইহা গোদের উপর বিষফোড়ার সমতুল।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এই কারণে জরুরি, কেননা পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার শুনানি বেশ কিছুদিন স্থগিত ছিল। এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করিবার জন্য বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রকেও কটাক্ষ করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। কেননা বিশ বছর পার হইয়া যাইলেও শেষ ফয়সালা এখনও হয় নাই। লালুপ্রসাদ যাদব ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির সঙ্গে যেসকল মামলা যুক্ত রহিয়াছে তাহা নয় মাসের মধ্যে ফয়সালা করিবার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়াছে তাহা অত্যন্ত সঙ্গত। কেননা বিশেষ আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম তো বিশেষ আদালতই মামলার নিষ্পত্তির জন্য দীর্ঘসময় লইয়া থাকে। ইহার পর শীর্ষ আদালতও যদি তৎপরতার পরিচয় না দেয়, তাহা বাস্তবিকই চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। রাজনৈতিক নেতা, আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় ২০১৩ সালে সিবিআই-এর বিশেষ আদালত লালুপ্রসাদ যাদবকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়াছে। কিন্তু দুই মাস পর লালুপ্রসাদ যাদব জামিনে মুক্ত হন। ইহার এক বছর পর ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট তাঁহার উপর আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে। হাইকোর্টের এই রায় খারিজ করিতে সুপ্রিম কোর্টের তিন বছর সময় লাগিয়া যাইল। প্রয়োজনের তুলনায় অধিকতর এই বিলম্ব আদালতে সাক্ষীদের প্রভাবিত করিতে পারে, সেইসঙ্গে অভিযুক্তদেরও বিড়ম্বনা বৃদ্ধি করে। এখন লালুপ্রসাদ যাদব যেহেতু পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত তাই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁহার প্রতিক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, এই রায় তাঁহার পক্ষে সুখবরই, কেননা এই মামলার নিষ্পত্তি শীঘ্রই হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতের রায় বিহারের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহা আদালতের বিবেচ্য বিষয় নয়। যথাসময়ে মামলার নিষ্পত্তিই আদালতের বিচার্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

ন চোরহার্য ন রাজহার্য ন ভ্রাতৃর্ভাজ্যং ন চ ভারকারী।
ব্যয়ে কৃতে বর্ধতি এব নিত্যং বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্।।

চোর চুরি করতে পারে না, রাজা কেড়ে নিতে পারে না, ভাইদের মধ্যে ভাগ হতে পারে না, ব্যয় করলে বেড়ে যায়—এই বিদ্যাধন সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।

গর্ভসংস্কারের মাধ্যমে সমর্থ ভারত গড়ার উদ্যোগ আরোগ্য ভারতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সন্তানের জন্মদানে ইচ্ছুক দম্পতিদের তিন মাসের শুদ্ধিকরণ, গ্রহ-নক্ষত্রের শাস্ত্র নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী শারীরিক মিলন, সন্তান-ধারণের পর ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিরতি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ও খাদ্যবিধি মেনে চললে সুন্দর মেধাবী স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য ও সেবা প্রদানকারী সংগঠন

আরোগ্য ভারতীর গর্ভবিজ্ঞান সংস্কারের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এইসব নিয়মনীতি পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উত্তম সন্তানলাভের সম্ভাবনা।

আরোগ্য ভারতী সূত্রে জানা গেছে, গর্ভবিজ্ঞান সংস্কার নামের প্রকল্পটি প্রায় এক দশক আগে গুজরাটে শুরু হয়েছিল। ২০১৫ সালে প্রকল্পের কাজ সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন এই প্রকল্পে আরোগ্য ভারতীর প্রধান সহায়ক বিদ্যাভারতী। শুধু মধ্যপ্রদেশ আর গুজরাটেই প্রকল্পের জন্য দশটি অফিস খোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের কাজে আরও গতি আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিকে বেছে নেওয়া হবে।

প্রকল্পের আহ্বায়ক প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডা. করিশ্মা মোহনদাস নারওয়ানি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য উত্তম সন্তান সৃষ্টির মাধ্যমে সমর্থ ভারত গড়ে তোলা। ২০২০-র মধ্যে এরকম হাজার শিশুর জন্ম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' প্রকল্পের চেয়ারপার্সন ডাঃ হিতেশ জানি বলেন, 'বাবা-মা নিম্নমেধা সম্পন্ন হতে পারেন। কিংবা হতে পারেন অশিক্ষিত। কিন্তু গর্ভসংস্কারের নিয়ম মেনে চললে তাঁদের সন্তান হবে মেধাবী। কৃষ্ণবর্ণ বাবা-মার সন্তান হবে উজ্জ্বল বর্ণসম্পন্ন।' উল্লেখ্য, হিতেশ জানি গুজরাটের জামনগর আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রধান। তিনি বলেন, 'গর্ভসংস্কারের কথা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।'

গত ৬, ৭ মে আরোগ্য ভারতী কলকাতার হাজরা পার্কের কাছে একল ভবনে গর্ভসংস্কারকে কেন্দ্র করে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। মোট ৬২টি দম্পতি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এঁরা অনেকেই সন্তান-সন্ততির বাবা-মা। কিন্তু গর্ভসংস্কারের নিয়মনীতি নিয়ে তাঁদের অপরিসীম উৎসাহ। ডাঃ হিতেশ জানি বলেন, 'এটা ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান। আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছি। ইতিমধ্যেই দেশের অন্য প্রান্তে গর্ভসংস্কার সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কলকাতায় প্রথম এই সেমিনার হচ্ছে বলে এখানকার মানুষ একটু উত্তেজিত।'

আরোগ্য ভারতীর কলকাতা মহানগর সম্পাদিকা জয়শ্রী রক্ষিত বলেন, 'এই সেমিনার যাতে না হয় তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইট্‌স। তাদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়। বাধাদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বামপন্থীরাও। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, শুধু বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সেমিনার। কোনোরকম প্রশিক্ষণ বা প্রদর্শনী চলবে না।' আরোগ্য ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল রাজ্য সরকার এবং বামপন্থীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখন দুর্গাপুজোর বিসর্জন থেকে শুরু করে গর্ভসংস্কার— সব কিছুতেই প্রশাসন এবং বামপন্থীরা বাধা দেয় এবং সমাধানের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। আরও একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার। যা কিছু ভারতের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের অন্তর্গত বামপন্থীরা তার বিরোধী। এই বিরোধিতা যে-গোপন ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস তারই ইঙ্গিত বামপন্থীরা আরেকবার দিলেন।'

জম্মু ও কাশ্মীরে অবৈধ পাক-সৌদি চ্যানেলে অবাধে ভারত-বিরোধী প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীরের ঘরে ঘরে ঢুকে সৌদি আরবের ধর্মপ্রচারক এবং পাকিস্তানের সাংবাদিকেরা 'আজাদ কাশ্মীরের' প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। জাকির নায়েকের নিষিদ্ধ পিস টিভি-সহ প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি পাক ও সৌদি চ্যানেলে সলাফি ইসলামের প্রচার চলছে। বেসরকারি কেবল নেটওয়ার্কের এইসব চ্যানেল পুরোপুরি অবৈধ এবং এখানে রাতদিন আজাদ কাশ্মীরের নামে ভারত-বিরোধী প্রচার চালানো হয়। কাশ্মীরে টাটা স্কাই, এয়ারটেল ডিজিটাল টিভি এবং ডিশ টিভির মতো স্যাটেলাইট টিভি থাকলেও বেসরকারি কেবল নেটওয়ার্কের রমরমা দিন দিন বাড়ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেবল অপারেটর এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শুধু শ্রীনগরেই ৫০,০০০ কেবল সংযোগ রয়েছে। এর কারণ এই সব নেটওয়ার্কে পাকিস্তানি আর সৌদি চ্যানেল দেখানো হয়।'

জাকির নায়েকের পিস টিভি ছাড়া কেবল অপারেটররা যেসব সৌদি ও পাকিস্তানি চ্যানেল দেখান তার মধ্যে রয়েছে— সৌদি সুন্নাহ্, সৌদি কুরান, আল অ্যারেবিয়া, পয়গম, হিদায়ত, নূর, মাদানি, শেহর, কারবালা, হার্দি, আরি কিউ টিভি, বেথত, আহলিওয়ত, মেসেজ, ফলক, জিও নিউজ, আরি নিউজ, ডন নিউজ ইত্যাদি। এই সব চ্যানেল স্যাটেলাইট টিভি নেটওয়ার্কে দেখা যায় না। তথ্য ও চেতার সম্প্রচার মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী এইসব চ্যানেল ভারতের সর্বত্র নিষিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে ডিরেক্টর অব ব্রডকাস্টিং অমিত ক্যাটক বলেন, 'কোনো কেবল অপারেটর দেশের কোথাও এমন কোনো চ্যানেল দেখাতে পারেন না যা তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত নয়। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে নাম নেই এমন কোনো চ্যানেল দেখানো সম্পূর্ণ বেআইনি। এমনকী সংশ্লিষ্ট চ্যানেলটি বিনামূল্যের হলেও তা বেআইনি।'

হুরিয়তের অ্যাকাউন্টে আই এস আই-এর টাকা, ষড়যন্ত্রে যুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠন হুরিয়তকে টাকা দেয় পাকিস্তান। এই কথাটা এতদিন কানাঘুষোয় শোনা যেত। এবার তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ইংরেজি সংবাদমাধ্যম টাইমস নাউ-এর অন্তর্তদন্তে প্রকাশ, হুরিয়ত নেতা সাব্বির শাহের সঙ্গে সম্প্রতি একটি বড়রকমের আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিশ্লেষণ করে টাইমস নাউ জানিয়েছে, এই টাকা দেওয়া হয়েছিল আই এস আই-এর চর মেহবুব আহমেদ সাগরের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, মেহবুব আহমেদ সাগরের সঙ্গে ভারতে নিযুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত আবদুল বাসিতের বেশ গভীর যোগাযোগ রয়েছে। খবরে প্রকাশ, আই এস আই মাসিক ভিত্তিতে সাগরকে টাকা দিত।

আবদুল বাসিত

সাগর সেই টাকা তুলে দিত জম্মু ও কাশ্মীর ডেমোক্রেটিক ফ্রিডম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সাব্বির শাহের হাতে। এই লেনদেন যে দীর্ঘদিন ধরে চলছে সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সাব্বির শাহের দাবি, পাকিস্তানের টাকার বড়ো অংশ নিহত জিহাদিদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা খরচ হয়েছে পাথর ছোড়ার কাজে। আরও জানা গেছে, শুধু সাব্বির শাহ নয়, ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য হুরিয়তের একাধিক নেতাকে টাকা দেয় আই এস আই। কারও কারও মাসমাইনেরও ব্যবস্থা আছে। এদিকে অভিযোগ পাওয়া মাত্র প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হুরিয়তের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপে পাকিস্তানের এই টাকা জোগানোর চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। বিষয়টি তুলে ধরা হবে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও।

নির্ভয়া ঘটনায় নাবালকের ছাড় পাওয়ায় জুভেনাইল আইনের সংশোধন চাইছেন সাধারণ মানুষ থেকে আইনজীবীরাও

স্বপন দাস ॥ ঘটনাটা ঘটেছিল ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ, ২০১২ সালে। বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখে ফিরছিল ২৩ বছরের প্যারা মেডিকেলের ছাত্রী নির্ভয়া আর তার বন্ধু। একটু রাত। বাসে তখন নিজের পুরুষ বন্ধু ছাড়া আরও ছয় জন। পরে জানা গেছে এরা সবাই ওই বাসের কর্মী। নির্ভয়াদের ওপর ওই ছয় জন ঝাপিয়ে পড়ে। নির্ভয়ার বন্ধুকে মেরে আধমরা করে ফেলে। আর একে একে ছয়জন বাস কর্মী তাদের আদিমতাকে চরিতার্থ করতে থাকে নির্ভয়ার সঙ্গে। এদের মধ্যে একজন আবার নাবালক। অত্যাচার শেষে নিথর দুটি দেহকে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তার ধারে। এখবর সবাই জানেন। গত ৫ মে, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সেই পাষণ্ডদের চারজনের (মুকেশ সিং, বিনয় শর্মা, পবন গুপ্তা, অক্ষয় ঠাকুর) ফাঁসির আদেশ বহাল রাখল। যে আদেশ দিল্লি উচ্চ আদলত ২০১৪-র মার্চ মাসে দিয়েছিল। বাকি দু'জনের একজন (রাম সিংহ) তিহার জেলে আত্মহত্যা করেছেন। আর একজন সেই সময়ে নাবালক (মহম্মদ আফরোজ) থাকায়, তিন বছরের সাজা শেষে মুক্ত। এখন সে খোলা হাওয়ায়। দক্ষিণ ভারতের একটি হোটেলের রাঁধুনি। অথচ সে সেই সময়ে তার জবানবন্দিতে যে কথা বলেছিল, ও প্রমাণিতও হয়েছিল, একটি লোহার শলাকা দিয়ে নির্ভয়ার অন্ত্রকে শরীরের ভিতর থেকে বাইরে এনেছিল সেই। এই অপরাধে তার চরমতম শাস্তি হলেও কম হোত, বলে মনে করেন সবাই। সেই সময়ে অবশ্য মানেকা গান্ধীর প্রতিবাদে রাজ্যসভায় জুভেনাইল অপরাধের ক্ষেত্রে একটি সংশোধনী পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জুভেনাইল অপরাধের ক্ষেত্রে বয়েসের সীমা কমে হয় আঠারো থেকে ষোল।

২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর, জাস্টিস ভার্মা কমিটি গঠিত হওয়ার পর, মাত্র ২৯ দিনে আইন সংশোধনের স্বপক্ষে ৮০ হাজার প্রস্তাব আসে। আর এই কমিটির সুপারিশ মেনেই ১৯৫৮ সালের আইনে সংশোধন আসে। সেখানেই এধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবনের থেকে মৃত্যুদণ্ডকে কার্যকর করার কথা বলা হয়। আর নাবালক অপরাধের ক্ষেত্রে বয়েসের সীমা কমিয়ে ষোল করা হয়। ষোল বছরের কেউ কোনো অপরাধ করলে তার বিচার বড়দের মতোই হবে। সেই প্রস্তাব ২০১৩ সালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য যায়। আর ২০১৫-তে রাজ্যসভায় জুভেনাইল জাস্টিস বিল পাশ হয়। কিন্তু এই সংশোধিত আইনেও আরও কম বয়সিদের চরমতম অপরাধ করার ক্ষেত্রে কী শাস্তি বিধান হতে পারে সেকথা বলা হয়নি। আর সেখানেই সাধারণ মানুষের প্রস্তাব, এইসব নাবালক অপরাধিদের ছেড়ে না দিয়ে ওই ষোল বছর পেরলেই বিচারে শাস্তি দেওয়া হোক। এই সময়টা তাকে হোমে রেখে বড় করে তোলা হোক। যদি যাবজ্জীবন সাজা হয়, তাহলে ওই হোমে থাকার সময়কাল বাদ দেওয়া হোক সে সাজা থেকে।

আইনজীবীদের অনেকেই মনে করেন নাবালকদের করা চরমতম অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান দেওয়ার সময়ে জুভেনাইল আইনে একটু পরিবর্তন আনা দরকার। নাবালকদের করা অপরাধের নিয়ে আইনজীবী তাপস কুমার ভঞ্জ বলেন, 'বর্তমানে অপরাধ প্রবণতা নাবালকদের মনে যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আইনকে নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার সময় এসে গিয়েছে। আর নাবালকরা এখন নানাভাবে জেনে যাচ্ছে যে তাদের করা অপরাধ থেকে খুব সহজেই ছাড় পাওয়া যায়। আর এজন্যই তাদের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা।'

বিশিষ্ট মোনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে এখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একজন নাবালক শৈশব থেকেই, তার পরিবেশের কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন থাকে তার অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে থাকা। আর থাকে সীমাহীন চাহিদা, আর বাবা মা মায়ের তরফ থেকে সে চাহিদা না মেটানো।

মোদীতেই আস্থা মেহবুবার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাশ্মীরের অশান্ত পরিস্থিতি শান্ত করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ভরসা রাখছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপরেই। গত ৭ মে জম্মুতে আয়োজিত এক জনসভায় মুফতি বলেন : 'আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। আমি আবার বলব যে আমরা তাঁর সমালোচনা করতেই পারি। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সমাধান যদি কেউ করতে সমর্থন হন, তবে তাঁর নাম অবশ্যই নরেন্দ্র মোদী। আপাতত জম্মু-কাশ্মীরের যা পরিস্থিতি তাতে পুলওয়ামা কিংবা সোফিয়ানের মতো জেলাগুলির স্পর্শকাতর এলাকায় প্রায় চল্লিশটি ব্যাঙ্ক-শাখায় ক্যাশ আদান-প্রদানকে যেভাবে লক্ষ্যবস্তু করার পথে এগোচ্ছিল জঙ্গিরা, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির তৎপরতায় তা বন্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে।

মেহবুবা তাঁর বক্তব্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ-কে আক্রমণ করে বলেন, তিনি বার বার বলেছিলেন যে লাহোরে তাঁর পৈতৃক ভিটে দেখতে যেতে চান। শ্রীমতী মুফতির মতে এর মাধ্যমে তিনি সমস্যার সমাধানের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু দৃঢ়তা না থাকার জন্যই তা করে উঠতে পারেননি। একইসঙ্গে মেহবুবা ২০১৫-র ডিসেম্বরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাহোর সফরসূচির প্রশংসা করে করে বলেন, একঘণ্টার সফরে মোদী বুঝিয়ে দেন ভারত সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় রেখে চলতে চায়, কিন্তু একে দুর্বলতা ভেবে থাকলে পাকিস্তান ভুল করবে।

উবাচ

"আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে এই ব্যাপারে আমাদের স্পষ্টতই আপত্তি আছে। কারণ এর সঙ্গে ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।"

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর এবং চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প প্রসঙ্গে।

"আমাদের সমাজ এখনও কিছুটা রক্ষণশীল। এখানে মহিলারা বিশেষ করে অল্পবয়সি মেয়েরা তাদের সতীত্ব সংক্রান্ত কোনো মিথ্যে কলঙ্ক হালকাভাবে নেয় না।"

আর ভানুমতি
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

নির্ভয়াকাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে।

"উত্তরপূর্বাঞ্চলে আমি বিশেষ গুরত্ব দিতে বলেছি কারণ স্বাধীনতার পর থেকে সেখানে সমানুপাতিক উন্নয়ন হয়নি। কোথাও বেশি হয়েছে, কোথাও কম, কোথাও একেবারেই হয়নি। আমরা উত্তরপূর্বের সম্পদ ব্যবহার করে সেখানকার সমানুপাতিক উন্নয়নে প্রয়াসী হয়েছি।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনোত্তর পর্বে উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

"অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে আমরা যে নীতি গ্রহণ করব তা হবে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। আগ্রাসন কাকে বলে টের পাবে ওরা।"

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সুকমায় মাওবাদী সন্ত্রাসের পর সরকারি নীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

"মুখ্যমন্ত্রী এবং আই এ এস অফিসার ভারতের সংবিধান রক্ষায় দায়বদ্ধ। কিন্তু ওই প্রশাসনিক সভায় যা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাকর। নৈতিকতা বা আইন, কোনও দিক থেকেই তা সমর্থন করা যায় না।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

প্রশাসনিক বৈঠককে রাজনৈতিক সভায় পরিণত করা প্রসঙ্গে।

ক্ষমতাধরেরা মনে রাখবেন, ‘আছে বল দুর্বলেরও’

আক্ষেপ এখন একটাই। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী হামলা চালালে বাঁচাবে কে? রাজ্যস্তরের বিজেপি নেতৃত্বকে নীচুতলার সাধারণ পার্টি কর্মীদের তোলা এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সম্প্রতি গঙ্গাসাগরের নারায়ণী আবাদে বিজেপির ঘরোয়া বুথ সভায় হামলা চালায় সশস্ত্র তৃণমূলী গুন্ডা বাহিনী। গুন্ডাদের বেধড়ক মারে গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপির ছ'জন স্থানীয় নেতা। তাঁদের মধ্যে আছেন জেলা কমিটির সদস্য ত্রিদিব ঢালি ও মণ্ডল কমিটির সদস্য বুদ্ধদেব ভূঁইঞা। যথারীতি খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কলকাতা থেকে দলের রাজ্য নেতাদের কেউ গঙ্গাসাগরে যাননি সরেজমিন তদন্তে। তৃণমূল নেতৃত্ব একটি সার কথা বুঝে গেছেন। এই রাজ্যে তাদের মারের বদলা নিতে পারে এমন কোমরের জোর বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস কোনো দলেরই নেই।

মারলে পাল্টা জবাব দিতে হবে। তবেই বিষাক্ত সাপ ফণা গুটিয়ে গর্তে ঢুকে যাবে। প্রতিটি হামলার প্রতিরোধ চাই। বাম জমানায় যেমনটি নন্দীগ্রামে এবং সিঙ্গুরে হয়েছিল। হয়তো বলবেন, তৃণমূলের হাতে পুলিশ ও প্রশাসনের মদত আছে। পুলিশ হামলাকারীদের না ধরে প্রতিরোধকারীদের ধরবে। জেলে পুরবে। হ্যাঁ, এসবই সত্যি। কিন্তু মনে রাখতে হবে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর পর্বেও পুলিশ প্রশাসন সবই সিপিএমের হাতে ছিল। পুলিশকে পার্টি ক্যাডারে পরিণত করেছিলেন বুদ্ধদেববাবুরা। তবু শেষরক্ষা হয়নি। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিলেন প্রতিরোধকারী সাধারণ গ্রামবাসীরা। কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীরা নন।

তবে আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষীরটুকু খেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আন্দোলন তাঁকে এবং তাঁর দলকে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

অথচ নন্দীগ্রাম আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিজেপি ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা প্রথম আন্দোলনকারী গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দিল্লি থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারাও এসেছিলেন নন্দীগ্রামে। তারপর জানি না কেন দলের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির

গূঢ় পুরুষের কলম

অদ্ভুত একটা অনীহা আমাকে সত্যি খুব অবাক করে। রামনবমী উদ্‌যাপন এবং পরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের বঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে যে বিপুল জনজোয়ার দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে তার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে কত নম্বর দেবেন সেটা আপনারাই স্থির করুন। তিনদিনের বাংলা সফর সেরে দিল্লিতে ফেরার আগে অমিত শাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে দলের রাজ্য নেতাদের কলকাতায় বসে রাজনীতি করার বদলে পশ্চিমবঙ্গের ৭৭ হাজার বুথেই গড়তে হবে বুথ কমিটি। স্বীকার করছি কাজটা কঠিন। প্রতিটি পদে জেলাস্তরের বিজেপি নেতাদের পড়তে হবে তৃণমূলের গুন্ডাদের আক্রমণের মুখে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট যদি সত্য হয় তবে বাংলার ৭৭ হাজার পোলিং বুথের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার বুথে বিজেপির বুথ কমিটি নেই। গত বিধানসভার ভোটে হাজার দুয়েক বুথে একটিও ভোট পাননি বিজেপি প্রার্থীরা। হাজার পাঁচেক বুথে গড়ে পাঁচটির বেশি ভোট পায়নি দলের প্রার্থীরা।

তবে একথাও সত্য যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে বুথ-ভিত্তিক কমিটি গড়তে গেলে জেলাস্তরের নেতারা বেধড়ক মার খাবেন। যেমনটি, গঙ্গাসাগর এলাকায় হয়েছে। জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা পাওয়া দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি নকশালবাড়িতে দলিত গ্রামবাসী রাজু মহালির বাড়িতে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন বলে সশস্ত্র তৃণমূল হামলাবাজরা রাজু এবং তাঁর স্ত্রী গীতাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তিনদিন বন্দি থাকার পর তাঁরা মুক্তি পান। শোনা যাচ্ছে যে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং একটি পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের তৃণমূলের খাতায় সই করানো হয়েছে। এই দলে সবই সম্ভব। অমিত শাহকে হেনস্থা করার সাহস হামলাবাজদের নেই। কারণ, অমিত শাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী। তারা উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেতা গৌতম দেবকেও রেয়াত করবে না। কিন্তু জেলাস্তরের বিজেপি নেতাদের বাঁচাবে কে? নিঃসন্দেহে তাঁদের রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য নেতাদের। তাঁদের স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে দলের নেতা, কর্মী, সমর্থকদের উপর হামলা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। আক্রান্ত হলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে এই নীতির মুখেই সিপিএমের হার্মাদরা পিছু হঠেছিল। তারপর আর মাথা তুলতে পারেনি। মনে রাখতে হবে সমাজে বলশালীর প্রতি যে শ্রদ্ধা থাকে তার এক শতাংশও দুর্বলের প্রতি থাকে না। রাজ্যের ৭৭ হাজার বুথের মধ্যে ৫০ হাজার বুথেও যদি বিজেপি বুথ কমিটি গড়তে পারে তবে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে জোর ধাক্কা দেওয়া অবশ্যই সম্ভব। এখন বৈশাখ মাস। এই মাসেই বাংলায় জন্ম নিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘আছে বল দুর্বলেরও’। তাই ক্ষমতাধরদের বলছি, শক্তির অহঙ্কার ছেড়ে গণতান্ত্রিক পথে বিরোধী দলের মোকাবিলা করুন। খুনের রাজনীতিতে আখেরে যে লাভ হয় না সিপিএমকে দেখে সেই শিক্ষাটা অন্তত নিন। ■

'সততা' তুতো দিদি আর ভাই কেমন আছেন?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সততা-র প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই দেশে এত অসৎ মানুষ আর তার মধ্যে দুজন ছিলেন 'সততার প্রতীক'। তাদের দু-জনের গায়েও কালি লেগে গেল। দেশটার কী হবে বলুন তো!

বাম জমানা শেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার পিছনে অনেক কারণ থাকলেও একটা বড় বিষয় ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তাঁর দলের সততার স্লোগান। একইভাবে দেশে আম আদমি পার্টির উত্থানের পিছনে ছিল দুর্নীতি বিরোধী স্লোগান। অন্না হাজারের আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া কেজরিবালের দলকে মানুষ বেছে নিয়েছিল দুর্নীতিবিরোধী দল হিসেবেই। এখন দুই দলের বিরুদ্ধেই প্রধান অভিযোগ— দুর্নীতি।

দুই ক্ষেত্রেই সরকার বেঁচে থাকবে কিন্তু কাঁটাও বিঁধবে। এমনই সঙ্কটে দেশের দুই প্রধান বিরোধী দল— এই রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস আর দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টি। সারদা, রোজভ্যালি- সহ বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের যোগাযোগ নিয়ে চলছে সিবিআই তদন্ত। এরই মধ্যে নারদকাণ্ডে কাঠগড়ায় দলের এক ডজন নেতামন্ত্রী। আর আম আদমি পার্টির মেরুদণ্ডই যেন ভেঙে যেতে বসেছে। রাজনৈতিক মহল এমনও বলতে শুরু করেছে যে, অরবিন্দ কেজরিবালের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠার পরে আপের শেষের সে দিন শুরু হয়ে গেল। দেখে নেওয়া যাক কীভাবে শুরু থেকেই নানা কেলেঙ্কারির অন্য নাম হয়ে ওঠে কেজরির আপ।

আসলে আপ-এর উত্থানও হয়েছিল হঠাৎ করে। প্রায় রাতারাতি বিপুল সমর্থন নিয়ে দিল্লিতে সরকার গঠন করে আপ। তখন দেশজুড়ে মোদী হাওয়া। সদ্য লোকসভা ভোটে বিজেপি বিপুল জয় পেয়েছে। তবুও ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭ আসন জিতে দিল্লি বিধানসভা ভোটের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ে আম আদমি পার্টি।

ক'দিন যেতে না যেতেই দলে বড় গোলমাল। প্রথমে শো-কজ নোটিস ও পরে দুই বড় নেতা যোগেন্দ্র যাদব এবং প্রশান্ত ভূষণ-সহ চার বিদ্রোহীকে দল থেকে বহিষ্কার করে আম আদমি পার্টি। অন্য দুই নেতার নাম আনন্দ কুমার এবং অজিত ঝা।

জুলাই মাসেই প্রথমে ডিগ্রি জালের অভিযোগে আইনমন্ত্রী জিতেন্দ্র তোমর গ্রেপ্তার এবং ক'দিন যেতে না যেতেই মনোজ কুমার নামে রাজধানীর কোণ্ডলি এলাকার এক বিধায়ক গ্রেপ্তার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি একটি জমির মালিক না হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে নিজের বলে ভুয়ো দলিল দেখিয়ে অন্য একজনকে বিক্রি করেছিলেন। এছাড়াও ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে আরও সাতটি মামলা ছিল। তার মধ্যে একাধিক প্রতারণা, এক মহিলা ও এক কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে মারধর করার অভিযোগ।

২০১৫ সালের আগস্টে পঞ্জাবেও বড়সড় ভাঙন দেখা গেল অরবিন্দ কেজরিবালের আম আদমি পার্টিতে। নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে পাল্টা সমাবেশ করায় পাতিয়ালার সাংসদ ধর্মবীর গাঁধী ও ফতেগড় সাহিবের সাংসদ হরেন্দ্র সিংহ খালসাকে সাসপেন্ড করে আপের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

মাত্র দেড় বছর আগে স্বচ্ছ রাজনীতি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন অরবিন্দ কেজরিবাল। কিন্তু দুর্নীতি, যৌন কেলেঙ্কারি-সহ নানা কাণ্ডের জেরে ছ'জনের মন্ত্রীসভা থেকে একে একে খসে যান তিন জন মন্ত্রী। একজন শিক্ষাগত যোগ্যতা জাল করে জেলে, একজন আর্থিক দুর্নীতিতে ডুবেছেন, আর তৃতীয় জন ফেঁসেছেন যৌন কেলেঙ্কারিতে।

এবার তো কেজরিবাল নিজেই ফেঁসে গেলেন ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ। সম্প্রতি কপিল মিশ্রকে পর্যটন ও জলমন্ত্রকের পদ থেকে বরখাস্ত করেন অরবিন্দ কেজরিবাল। সরিয়ে দেওয়া হয় জলবোর্ডের সভাপতির পদ থেকেও। দিল্লির পুরভোটে দলের ল্যাজেগোবরে অবস্থা হওয়ার পর, কুমার বিশ্বাসের পক্ষ নিয়ে দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন মিশ্র। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তুমুল তরজায় জড়িয়ে পড়েন তখন থেকেই। কপিল অভিযোগ করেন তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিবালকে নগদ ২ কোটি টাকা ঘুষ নিতে দেখেছেন।

এরপরেও কেজরিবাল পদত্যাগ করবেন না। কারণ, তাঁর দিদিও অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও পদে বসে রয়েছেন। এর পরে যে কী কী হবে কে জানে?

—**সুন্দর মৌলিক**

কানঢাকা টুপি আর আমাদের সুশীল সমাজ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকে দুটি রাজ্যের কথা বলা আছে। একটির নাম শিবতরাই, অন্যটির নাম উত্তরকূট। এই দুই রাজ্যের দুই গুরু। এই দুই গুরুর ফতোয়াই দুই রাজ্যের পক্ষে শেষ কথা। শিবতরাই রাজ্যের যিনি মন্ত্রী, অর্থাৎ ওই রাজ্যের শাসনযন্ত্রটির চালক, তিনি মনে করেন— বুদ্ধি বেশি থাকার দরকার নেই। বুদ্ধি বেশি থাকলে 'কাজ কলের মতো চলে না।' অতএব, দেশের মানুষকে ঠিক কী বলতে হবে--- তা গুরুমশাইকে এই মন্ত্রীমশাইরাই শিখিয়ে দেন। মন্ত্রীমশাই যেমনটি শিখিয়ে দেন গুরুমশাইও দিনের পর দিন তাই শিখিয়ে যান দেশের মানুষকে। এতে মন্ত্রীমশাই বেজায় খুশি। তার শাসনের কাজে এতে সুবিধা হয়। শিবতরাইয়ের মানুষরা সবসময় কানঢাকা টুপি পরে থাকত। এই কানঢাকা টুপিতেই তাদের চেনা যেত। 'এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন'— নাটকের একটি চরিত্র এরকম প্রশ্নও করেছিল। তার উত্তরে আর একটি চরিত্র বলেছিল— 'ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে।' শিবতরাইয়ের মানুষদের এইরকম কানঢাকা টুপি পরে থাকার নিদান দিয়েছিলেন গুরুমশাই। গুরুমশাইয়ের ধারণা হয়েছিল, এইরকম কানঢাকা টুপি পরে থাকলে বহির্জগতের বাণী আর মস্তিষ্ক স্পর্শ করবে না। আর যদি তা স্পর্শ না করে, তাহলে মানুষ হবে, সেই 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীন যেমন বলেছিল, 'সরকারি ছাঁচে ঢালা পুতুল'— সেইরকম। সেইরকম মানুষকে শাসন করা যে সহজ! কাজেই মন্ত্রীমশাইয়ের বুদ্ধিমতো গুরুমশাই কানঢাকা টুপি পরার নিদান দিয়েছিলেন শিবতরাইয়ের মানুষদের। তবে, মুক্তধারা নাটকে সবাই কিন্তু কানঢাকা টুপি পরেনি। নাটকের একটি চরিত্র, ধনঞ্জয়, তার আপত্তি ছিল কানঢাকা টুপি পরার। সে শিবতরাইয়ের মানুষদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, 'জগতটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকে মৃত্যুবাণ আসবে।'

শিবতরাই গ্রামের ওই মানুষগুলির মতো, হালের বাঙালি বিদ্বজ্জনরাও, যাদের আমরা বলি সুশীল সমাজ, তাঁরাও কানঢাকা টুপি পরে রয়েছেন। তাঁদের অবশ্য কোনো গুরুমশাই কানঢাকা টুপি পরার নিদান দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। তবুও তাঁরা পরেছেন, যাতে অনেক সত্যকেই অস্বীকার করা যায়, অনেক সত্য থেকেই অনায়াসে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তাতে লাভ কী? তাতে লাভ এটাই যে— অতি সহজেই ওই মুক্তধারা নাটকের মন্ত্রীমশাই বা শাসনযন্ত্রের কর্তাদের প্রসাদ লাভ করা যায়। যে প্রসাদ লাভের নেশায় শিবতরাইয়ের গুরুমশাই সকলকে কানঢাকা টুপি পরার নিদান দিয়েছিলেন। এই যে 'সুশীল সমাজ' এবং 'বিদ্বজ্জন' শব্দদুটি আজকাল খুব চলছে। এই শব্দদুটির বহুল প্রচলন শুরু হয় সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকে। সময়ের দাবিতে সেই সময় সুশীল সমাজ শহরের রাজপথে নেমেছিলেন। বলতেই হবে, সেই সময় এই সুশীল সমাজের ভূমিকা যথেষ্ট সাহসী এবং সদর্থক। চৌত্রিশ বছরের বাম অপশাসন এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে তাঁরা গর্জে উঠেছিলেন। কলকাতা শহর এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যক্ষ করেছিল সেদিন। সেই মিছিলের কোনো রাজনৈতিক রঙ ছিল না, মিছিলে কোনো রাজনৈতিক ঝান্ডাও ছিল না। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাংলার সুশীল সমাজ এবং তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষ। অনেকটা সেই জরুরি অবস্থার প্রাক্কালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জন-আন্দোলনের মতোই। এবং এটাও এখন অস্বীকার করা যাবে না যে, সেই সময় সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সুশীল সমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলন অনেকটাই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলার মানুষ আশা করেছিলেন, সেই সময় যে নাগরিক আন্দোলনটি জন্ম দিয়েছিল, সেই আন্দোলন ফল্গুধারার মতোই এই সমাজের বুকে প্রবহমান হবে। এবং ভবিষ্যতে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা প্রতিবাদে সরব হবেন। কিন্তু এরকম আশা, অচিরেই দুরাশায় পরিণত হতে সময় নিল না। চৌত্রিশ বছরের বাম অপশাসনের পর নতুন শাসকরা এই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে সুশীল সমাজ, তাঁরা সজ্ঞানে নাগরিক আন্দোলনের গলা টিপে হত্যা করলেন।

বামপন্থীরা ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে ২০১১ সালে। এটি ২০১৭ সাল। এই ছ' বছরে পশ্চিমবঙ্গ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে— একথা বলা যাবে না। বরং, যে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পশ্চিমবঙ্গকে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিল বামপন্থীরা, তাকে আরও অতলে, আরও গভীর পঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে নতুন শাসকরা। গত ছ' বছরে এই রাজ্যে অজস্র নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, নগ্ন তোষণের রাজনীতির ফলস্বরূপ বেড়েছে ইসলামিক মৌলবাদের দৌরাত্ম্য, কায়েম হয়েছে ইসলামিক ফতোয়া-রাজ, একের পর এক অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছে ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ, পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই হয়ে উঠেছে জঙ্গি-জেহাদিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, শাসক দলের সর্বময় নেত্রী ক্রমেই হয়ে উঠেছেন মৌলবাদী ভারত-বিরোধী মোল্লা- মৌলবিদের হাতের ক্রীড়নক, পশ্চিমবঙ্গেরে অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে। তদুপরি রয়েছে শাসকদলের নেতাদের একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া। এলাকায় এলাকায় শাসকদলের ছোট বড় মাঝারি নেতাদের তাণ্ডব এবং তোলাবাজি। গত ছ' বছরে এক অদ্ভুত

মাৎস্যন্যায় দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যটিতে। আদৌ এই রাজ্যে কোনো সুস্থির সরকার আছে কিনা— প্রশ্ন সেটাই। এই ছ' বছরে বাংলার সুশীল সমাজটির ভূমিকা কী? বলতেই হচ্ছে, শুরুতেই ওই যে কানঢাকা টুপির কথা বলেছিলাম— সেই কানঢাকা টুপিটিই গত ছ' বছরে বেশ আটোসাঁটোভাবে মাথায় চাপিয়ে নিয়েছেন বাংলার সুশীল সমাজ।

কেন তাঁরা এরকম করলেন? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বাম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা একদিন প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছিলেন তাঁদের আজ এই আচরণ কেন? মনে রাখতে হবে, নাগরিক আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা দেবেন, তাঁরাই যদি শেষ পর্যন্ত কোনো বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষের অনুগ্রহভাজন হয়ে পড়েন, সরকারি খেতাব এবং সুবিধার মোহে শাসকদলের স্তাবকতায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েন— তাহলে সেই নাগরিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোনো সফলতায় পৌঁছয় না। আমি বলব, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে যে নাগরিক আন্দোলন— তাও শেষ পর্যন্ত কোনো সফলতায় পৌঁছতে পারেনি। একথা সত্য, একদল শাসককে সরিয়ে এই আন্দোলনের নেতারা অন্য একদল শাসককে ক্ষমতায় এনেছেন। কিন্তু এক শাসকের পরিবর্তন করে অন্য শাসককে ক্ষমতায় বসানোর ভিতরই নাগরিক আন্দোলন শেষ হয়ে যায় না। নাগরিক আন্দোলন একটি চিরপ্রবহমান স্রোত। যে স্রোত ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন— তাকে সঠিক পথে চালিত হতে বাধ্য করবে। দুর্ভাগ্যের, বাংলার সুশীল সমাজ তেমন কোনো নাগরিক আন্দোলনের জন্ম দিতে পারেননি। বরং, দেখা গেল, শাসকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সুশীল সমাজের প্রতিবাদী চেহারাটিও অন্তর্হিত হলো। তাঁরা হয়ে পড়লেন শাসকের কৃপাধন্য। নানারকম ভূষণ এবং পুরস্কারে তারা ভূষিত হলেন। নানা কমিটির স্থান পেতে শুরু করলেন। নানা সরকারি আর্থিক ভাতাও জুটতে লাগল তাঁদের। কেউ কেউ কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। সরকারি ছত্রছায়ায় ফুলে ফলে এই সুশীলদের জীবন ভরে উঠতে লাগল। এক কথায়, নিজেদের হৃদয় এবং মস্তক বিকিয়ে দিলেন এই সুশীল সমাজের তাবড় প্রতিনিধিরা।

গত ছ' বছরে পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড ঘটল, কামদুনি ঘটল, কালিয়াচক ঘটল, ধুলাগড় ঘটল, খাগড়াগড় ঘটল, একের পর এক নক্কারজনক এবং নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেই যেতে থাকল। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আরবিকরণ হলো, ইমামভাতা চালু হলো, মোল্লা-মৌলবিদের ফতোয়ায় কার্যত শরিয়তি ব্যবস্থা চালু হওয়ার উপক্রম হলো পশ্চিমবঙ্গে। সরস্বতী পুজো বন্ধ করে নবি দিবস পালনের দাপট দেখানো হলো, হিন্দুর দুর্গাপূজা ভাসানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। আর বাংলার সুশীল সমাজ কী করলেন? প্রতিবাদ করলেন? একবারও বললেন— শরিয়তি বাংলা আমরা চাই না? একবারও বললেন— পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, কালিয়াচক, ধুলাগড়ের অপরাধীদের শাস্তি চাই? না, একবারও বললেন না। বলতে গেলে, তাঁদের মুখে কোনো রা-ফুটল না। আসলে, বর্তমান শাসকরা ক্ষমতায় আসার পর এই সুশীল সমাজ অটোসাঁটোভাবে কানঢাকা টুপিটি পরে নিয়েছেন। পণ করেছেন কিছু শুনবেন না। কিছু দেখবেনও না। সুশীল সমাজের যে প্রতিনিধি একসময় লিখেছিলেন, 'আলু বেচো, পটল বেচো, কলম বেচো না', সেই তিনিই সবার আগে তাঁর কলমটি বেচে বসে রইলেন। আসলে প্রতিবাদী হতে গেলে সাহসী হতে হয়; সৎ এবং আপোশহীন হতে হয়। বাংলার সুশীল সমাজ এটুকু প্রমাণ করেছেন— তাঁরা সাহসী, সৎ এবং আপোশহীন কোনোটিই নন। বরং, তাঁরা যে কিছু পেতে লালায়িত, সরকারি প্রসাদের জন্য তাঁরা যে সর্বদাই উন্মুখ— এটিই প্রমাণ করে ছাড়লেন তাঁরা। তাঁদের এই চরিত্রটি চিনে নিতে বর্তমান শাসকদের খুব দেরি দেয়নি। অতএব সরকারি প্রসাদ বিলি করে অতি সহজেই এই সুশীল সমাজকে কিনে নেওয়া গেল। এঁরা যাতে সর্বদা কানঢাকা টুপি মাথায় পরে থাকেন— সেই ব্যবস্থাও করে ফেলল বর্তমান শাসক। মুক্তধারার গুরুমশাই মন্ত্রীমশাইয়ের শিখিয়ে দেওয়া বার্তাই দেশের মানুষদের দিতেন। এঁরাও সত্যকে গোপন করে সেই বার্তাই দিতে থাকলেন— যা শাসককে খুশি করে।

পরিশেষে, এ প্রশ্ন উঠতে পারে— যে সুশীল সমাজকে নিয়ে এত কথা বললাম— সে কি সত্যিই সুশীল সমাজ? সে কি সুশীল সমাজ হতে পারে আদৌ? যে সমাজ নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দেয় শাসকের পায়ে, যে সমাজ ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করে, যে সমাজ সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, যে সমাজ অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে— সে কি সত্যিই সুশীল সমাজ? আদৌ কি সুশীল সমাজ বলা যায় তাকে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়/তার পথের কাঁটা/ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।' রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা যাঁরা একলা দলতে পারবেন, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে যাঁরা একা বজ্রানলে জ্বলতে পারবেন, যাঁরা সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না, যাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহসী হবেন— প্রকৃত সুশীল তাঁরাই। তাঁরাই বিদ্বজ্জন। তাঁরাই শ্রদ্ধেয়। যিনি আলু-পটলের মতো কলমকেও বিকিয়ে দিয়ে এলেন, তিনি কখনই সুশীল, বিদ্বজ্জন, শ্রদ্ধেয় হতে পারেন না।

সুশীল সমাজের ভেক ধরে যাঁরা কার্যত শাসকের মনতুষ্টিতে ব্যস্ত থাকেন— তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই, উঠছেও। বাংলার সুশীল সমাজকে নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই প্রশ্নই উঠছে যে, এঁরা একদা যে আন্দোলন করেছিলেন— তা কি সত্যিই নাগরিক আন্দোলন করার লক্ষ্যে? নাকি সময় বুঝে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে? নাগরিক আন্দোলনের নাম করে সমগ্র নাগরিক সমাজকেই এঁরা ধোঁকা দেননি তো?

বাংলার সুশীল সমাজকে নিয়ে এ সংশয় তো থাকবেই। এই সমাজের অনেক মাথা যে সময়-সুযোগ বুঝে গায়ের রঙ পালটে লাল থেকে সবুজ হয়েছেন। রাজনৈতিক পট আর একবার পরিবর্তন হলে এঁদের অনেকের কণ্ঠেই যে শ্রীরামের জয়ধ্বনি শোনা যাবে— তাও বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন। ■

পাকিস্তানি বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা প্রয়োজন

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অ:প্রা:)

বহু দশক ধরে আমরা ঘোষণা করে আসছি, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আনাই অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু সেই বহু দশক ধরে পাকিস্তান নিঃশব্দে পাক- নাগরিকদের শরণার্থী সাজিয়ে ক্রমাগত ভারতে তথা কাশ্মীরে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় পাকাপাকি ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে চলেছে। এই বিষয়টি আমার প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, ১৯৬৫-র যুদ্ধের পর যখন আমাকে পাকিস্তানের সিয়ালকোট থেকে উরিতে চলে যেতে হয়। এক চাঁদনি রাতে যখন আমার ব্যাটালিয়ন মাইক, হকিকত, কারাপাথর সীমান্ত কঠোরভাবে পাহারা দিচ্ছে যাতে একটা শেয়াল-কুকুরও ওই সীমান্ত দিয়ে এপারে ঢুকতে না পারে, আমিও আমার সেবাদারকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে দেখছি সৈনিকরা কতটা সতর্ক রয়েছে, আমার মনে হলো, মাঝে মাঝে পাকিস্তানি কামান ও মেসিনগান গর্জে উঠলেও কোনো মানুষের অনুপ্রবেশ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পরদিন সকালে উরির পুলিশ থানা 'লাগামার' বড়বাবু ফোন করে জানালেন গতরাতে এক পরিবার পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাক সৈন্যদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এপারে চলে এসেছে এবং যে পথ দিয়ে তারা উরিতে ঢুকেছে সেটা আপনার এলাকা বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনাকে ফোন করছি। আপনার পক্ষে কী এখন একবার থানায় আসা সম্ভব হবে?

'নিশ্চয়, আমি এখুনি আসছি।' ভাবলাম এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? থানায় পৌঁছে দেখি বছর তিরিশের এক তরুণ, বোরখায় মুখঢাকা এক তরুণীকে নিয়ে বসে রয়েছে, পাশে একটা সাদা কাপড়ের পুঁটলি। হয়তো একপ্রস্থ জামা কাপড়। তরুণীকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন। চেহারা দেখে লোকটিকে প্রথম দর্শনে কাশ্মীর বলে মনে হলো না। বরং পঞ্জাবি বলেই মনে হলো। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোন পথ দিয়ে এসেছ? সে বার কয়েক 'সালামাবাদ' গ্রামের নাম নিয়েছিল, কিন্তু পথের বর্ণনা আমার এলাকার সঙ্গে মোটেই মিলল না। থানার কর্তাকে বললাম, কাশ্মীরি ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে। বুঝলাম তারা কাশ্মীরি ভাষায় দু-চারটে কথার বেশি বলতে পারে না বরং কথার মাঝে উর্দু শব্দই বেশি ব্যবহার করছে। থানার বড়বাবুকে জানিয়ে ছিলাম ওরা পঞ্জাবি, মোটেই কাশ্মীরি নয়। আমার ব্রিগেড কমান্ডার তাঁর অফিসে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে আমার এলাকা দিয়ে পাকিস্তানি শরণার্থীরা উরি পৌঁছে গেল? তাঁকেও জানিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস ওরা পঞ্জাবি এবং যে পথের বর্ণনা দিয়েছে, সেই পথে ওরা আসেনি। ওদের বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, কাশ্মীর সরকার কিছুই করেনি। বরং তাদের বিনামূল্যে জমি ও ঘর বানাবার জন্য টাকাও দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দফায় যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৬ -৭৭ খ্রিস্টাব্দে বড় কাজীনাগ পাহাড়ের কাছে মালিঙ্গা গিরিপথের নিকটে আমার পেট্রল সাদা পোশাকে দুজনকে ধরে এনেছিল। তারাও ওই একই কথা বলেছিল, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পাক সৈন্যের অত্যাচারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তারাও শরণার্থী। আমার বিশ্বাস তারাও পাক-পঞ্জাবি। পাকিস্তান তাদের কাশ্মীরে স্থায়ী বসবাসের জন্য পাঠিয়েছিল।

সরকারি তথ্য বলছে বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন্য পাক সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বহু পাকিস্তানি নাগরিক কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিয়ে প্রকৃত কাশ্মীরীদের ভয় দেখিয়ে সুরক্ষা বাহিনীর উপর প্রস্তর বৃষ্টি, গ্রেনেড হামলা, পাক-পতাকা উত্তোলন ও 'আজাদি', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি আওয়াজ তুলতে বাধ্য করছে। আমার চৌকিতে যেসব গ্রামবাসী ভার বাহক, জলবাহক, পত্র বাহক হিসেবে বছরের পর বছর কাজ করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই বলত, পাকিস্তান এত গোলাগুলি চালাচ্ছে অথচ তোমরা জবাবি গুলিও চালাও না, দাওতো দুটো গ্রেনেড, ঝন্ডিমালী পোস্টে গিয়ে বাঙ্কারে দুটো গ্রেনেড মেরে ওদের একটু কষ্টটা বুঝিয়ে আসি! শায়েস্তা করে আসি!

'হুকুম নেই রে ভাই, আমরা যে অস্ত্রবিরতি স্বাক্ষর করেছি।'

ধারণা করা সম্ভব নয়, সেই গ্রাম্য কাশ্মিরিরা 'কাশ্মীরিয়ৎ' ভুলে গেল! ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর গায়ে হাত তোলার সাহস পায় কী করে?

কাশ্মীরের পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। নতুন স্ট্রাটেজি দ্রুত খুঁজতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে শুধুমাত্র গুলির বদলে গুলি অথবা এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়ার নীতি নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে।

পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সামরিক বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র। একমাত্র সেই কারণেই পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের প্ররোচনায় এবং মৃত্যুভয়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নব প্রজন্মের তরুণরা সুরক্ষাকর্মীদের উপর পাথর বৃষ্টি, গ্রেনেড বৃষ্টি, এমনকী তাদের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তাদের ক্যাম্পে হানা দেওয়ার সাহস করছে। গুলির বিরুদ্ধে গুলি চালালে অবস্থার সুরাহা হবে না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী তথা অনুপ্রবেশকারীদের মনে ভয়ের

সঞ্চার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ওয়ানি (হিজবুল মুজাহিদিন) নিহত হয়েছেন, কিন্তু তিনি তো অহিংস আন্দোলন করছিলেন না। অস্ত্র নিয়ে সুরক্ষাকর্মীদের আক্রমণ করেছিলেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর জন্য এত ছিছি করার কী আছে। বরং আমি বিশ্বাস করি কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ উপদ্রুত অঞ্চলে মাইক নিয়ে প্রতিটি গ্রামে ঘোষণা করতে হবে, পাথর বৃষ্টি হলে অথবা গ্রেনেড হামলা হলে সুরক্ষাকর্মীদের হাত আর বাঁধা থাকবে না, তাদের নিজেদের মতো করে যোগ্য উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে যদি কিছু সংখ্যক লাশ পড়ে যায়, তার জন্য কোনো আন্দোলন করার অনুমতি থাকবে না। তা সত্ত্বেও যারা পাথর বৃষ্টি করতে আসবেন তাদের কী হতে পারে, জেনে শুনেই আসবেন। যারা পাকিস্তানি পতাকা তুলবেন অথবা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবেন তাদের লক্ষ্য করে গুলি চলবে। দশ বিশটা লাশ পড়ে গেলে কাশ্মীর পাকিস্তান হয়ে যাবে না। কোনোদিনই হবে না। হুরিয়তের যে অংশ পাকিস্তানি অর্থে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তাদের বুঝতে হবে ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সংবিধানের দয়ায় তারা আজও জীবিত রয়েছেন। পাকিস্তানে থেকে এমন কাজ করলে বহু আগেই তাদের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলতো অথবা 'সামারি জেনারেল কোর্টমার্শাল' করে গুলি করে শেষ করে দেওয়া হোত, আলিশাহ জিলানির মতো দেশদ্রোহীদের।

দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর সীমান্ত এমনভাবে সুরক্ষিত করতে হবে যাতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কাঁটাতারের বেড়া সুউচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে কোনো কাজের নয়। ১৫-২০ ফুট বরফের তলায় ওইসব বেড়া ঢাকা পড়ে যায়। স্টেট অব দি হার্ট, বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক্স যান্ত্রিক ব্যবহার করতে হবে। দিল্লীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বাবুরা যত সত্বর ব্যাপারটা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ব্যয় বরাদ্দ করবেন, অবস্থার উন্নতি তবেই হবে। তবে এটাও বুঝতে হবে পাকিস্তান নেপাল, বাংলাদেশ অথবা অন্য যে-কোনো তৃতীয় রাষ্ট্র মারফত জাল পাসপোর্ট ইত্যাদি দ্বারা ভারত ভূখণ্ডে তাদের সন্ত্রাসবাদীদের পৌঁছে দেবে, তারপর ট্রেন ধরে কাশ্মীরে পৌঁছনো কোনো অসুবিধাই নয়। সমুদ্রপথে ভারতের যে-কোনো সমুদ্রোপকূল রাজ্যে নামিয়ে দিলেও ট্যুরিষ্ট হিসেবে কাশ্মীর পৌঁছনো কোনো অসুবিধেই নেই। অতএব ভারতের সমস্ত সীমান্ত কঠোর ভাবে সুরক্ষিত রাখার কোনো বিকল্প নেই।

সেই একই সঙ্গে অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকেও কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে পোস্ট থেকে গোলাগুলি চলবে অথবা অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশের প্রয়াস করবে, সেই পোস্ট গুঁড়িয়ে দিতে হবে। অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সৈনিকের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা, ভারতের সামরিক ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়। ভারতের যেসব শান্তিকামী বড় সাহেবরা শান্তির বাণী প্রচার করবেন অথচ পাকিস্তানি বর্বরতার উল্লেখ পর্যন্ত করতে ভয় পান, তাঁদের মুখ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। আলোচনা হবে, তবে পাকিস্তানকে সব রকম শত্রুতা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় না ক্রিকেট, না গান বাজনা, না সিনেমা না কোনো আমদানি-রপ্তানি পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, পাকিস্তানের হাতে তোমাদেরও রক্ত ঝরেছে, তবু বহু বিলিয়ন ডলারের ভিক্ষাদান বন্ধ করছ না কেন?

কুপুয়ারায় সামরিক ক্যাম্পে আক্রমণ করার পর আবার কুলসামে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে প্রায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের এ কে ৪৭ রাইফেল নিয়ে পাক জঙ্গিরা পালাতে সক্ষম হয়েছে। অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এর আগে উরি, পাঠানকোট, পুণে, মুম্বই ইত্যাদি জায়গায় পাকিস্তান সরকার তাদের আই এস আই, সামরিক বাহিনী এবং লস্কর-ই-তৈবা এবং জয়েস-ই-মুহম্মদের কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের ছায়াযুদ্ধে ব্যবহার করে অনেক ভারতীয়র রক্ত ঝরিয়েছে। এবার সময় এসেছে সে সবের মূল্য উশুল করার। তবে সুরক্ষা কর্মীদের হাত বেঁধে বলির পাঁঠা করে তা হবে না।

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ট্রাক-টুতে চলতে পারে যদি পাকিস্তান কথা দেয় যুদ্ধ-বিরাম ভঙ্গ করবে না এবং সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে। প্রয়োজনে তাদের আই এস আই এবং সামরিক বাহিনী স্তরেও আলোচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু কাশ্মীরবাসীদের হৃদয়মন বড় করাটা বেশি প্রয়োজন। বাকি ভারতবাসী কাশ্মীরের মানুষকে ভালবাসেন সেটা তাদের বোঝাতে হবে। পাকিস্তানের বিরূপ চালে তাদের অনেকেই ভারতকে শত্রু হিসেবে মনে করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার নামে কাশ্মীরে আসছে, বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান সেই সমস্ত অর্থের হদিশ সহজেই সরকারের নজরে আনতে পারে। ওই অর্থ যাতে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে না পৌঁছয় সে ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হবে। সেই সঙ্গে কাশ্মীরের প্রতিটি গ্রামে মাদ্রাসা খুলে ছেলেমেয়েদের কট্টরপন্থী ইসলামে (র‌্যাডিফ্যালাইজেসন) দীক্ষিত করার যে বিরাট প্রকল্প পাক-জেহাদি গোষ্ঠী গ্রহণ করেছে, আইন করে তা বন্ধ করার সময় এসেছে। রাজ্য সরকারকেই এই কাজ করতে হবে।

লেখা শেষ করার সময় জানা গেল, পাক সৈন্যরা পুঞ্চের ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে ভারতীয় সৈন্যদের শুধু হত্যাই করেনি, সৈনিকদের মৃত শরীরগুলিও ছিন্ন ভিন্ন করে রেখে গেছে। বোঝা যায় আমরা আমাদের ঘর সামলাতে পারছি না, মাত্র কিছুদিন আগে মৃত ভারতীয় সৈনিকের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে হোলি খেলেছিল। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে নিজেদের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে কাজ করতে হবে। গাফিলতি থাকলে, শুধু নিজ প্রাণের বলিদান দিলেই হবে না। শত্রুর লাশও ফেলতে হবে। অন্যথায় ইউনিটের অফিসারদের শাস্তি পেতে হবে।

কাশ্মীর উপত্যকায় শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে জীবন মানের দ্রুত উন্নয়ন এবং কর্ম সংস্থান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের হৃদয়মন জয় করাই এই ছায়া যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পথ। বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর আঘাতও করতে হবে, তাহলেই শান্তির পরিবেশন ফিরে আসবে। ■

তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আত্মহননের পথ মসৃণ করছেন

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

লেখাপড়া শেখা বাঙালি মাত্রই একটা ধারণা পোষণ করে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। সেটা হলো বাঙালি আজ যা ভাবে বাকি ভারত আগামীকাল তা ভাবে। অনেকে আবার

তসলিমা বিতাড়নের দাবিতে পার্ক সার্কাসে জিহাদি তাণ্ডব।

মহামতি গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) নাকি এই উক্তি করেছিলেন বলে প্রচার করেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, কবে কোথায় উনি একথা বলেছিলেন তার নাকি কোনো তথ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি। এটা সবারই জানা যে ভিনরাজ্য বা বিদেশের মান্য অতিথি মাত্রই এ রাজ্যে বা শহরে এলে আতিথ্য থেকে ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য ব্যয় করেন। এটা সৌজন্যের মধ্যে পড়ে। সকলেই তো আর মেকলে, কিপলিং, নইপল নয়। কলকাতার প্রাণবন্ত সংস্কৃতির কেউ বাহবা দিলে আমরা আহ্লাদিত হই। কিন্তু উৎসব, মেলা, গানবাজনার প্রাচুর্য যেটা হোপ '৮৬ থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছে তা যে আজ কবিগুরুর ভাষায় 'তৈলহীন প্রদীপের অন্তিম চাঞ্চল্যের' সমান সেটা আমরা বারোয়ারি বাঙালি মানতে নারাজ।

বঙ্কিমবাবু, রবিঠাকুর, বিবেকানন্দের মতো মানুষজনও চাঁছাছোলা ভাষায় অলস সর্বজ্ঞ বাঙালির এই প্রবৃত্তির সমালোচনা করেছেন নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু গড় বাঙালি ও বিশেষ করে জ্ঞানপাপী বাঙালি এই আত্মদর্শনে, বলা ভালো আত্মসমালোচনায় নারাজ। এই বাঙালি প্লেটোর স্মরণীয় উক্তি--- "The uncriticised (or unexamined) life is not worth living" মানতে অনিচ্ছুক।

আমরা জানি, আগস্ট ১৮৯৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ এই ছ'মাস শ্রীঅরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় লিখতেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এক ধারাবাহিক লেখায় তিনি লিখেছিলেন--- "What Bengal think tomorrow, India will think to-morrow week." (অমলেশ ভট্টাচার্য, বরোদায় অরবিন্দ, শ্রীঅরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির পৃ. ২৮৯)। মহামতি গোখলে এই প্রসঙ্গের কোথাও উল্লেখ করলেও করতে পারেন।

প্রায় সকলেই জানে কিপলিং কাদের কথা মাথায় রেখেছিলেন যখন তিনি তাঁর বিখ্যাত The Jungle Book-এ লিখলেন— "What the Bandar Log think today the Jungle thinks tomorrow." কিন্তু মজার কথা হলো কিপলিং-এর বহু আগে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে একপাল বানরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই মহাজ্ঞানী মহাজনদের দিন অনেককাল বাঙালি পেরিয়ে এসেছে। আজ বাঙালি কেবলই অনুসরণকারী। এমন কোনো নজির আজ আমরা দেখাচ্ছি না যা বাকি ভারত অনুসরণ করছে। স্বাধীনোত্তর বাঙালি এতটাই Myopic হয়ে গেছে যে বাঙালি বিজ্ঞানীর প্রাণপণ পরিশ্রমের ফসল যে কম্পিউটারের প্রয়োগ তাকে কুলোর বাতাস দিয়ে দক্ষিণ ভারতে চালানে তৎপর হয়। সেটাই বোধ হয় বাঙালির শেষ অগ্রগণ্য ভাবনা যা বাকি ভারত গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে বাংলার অন্তর্জলি যাত্রার শুরুও সেটাই বলা যায়। কারণ এদেশে Fifth Generation Computer চালুর অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে সেদিন তাঁরই আশ্রিত কর্মীদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছিল— 'প্রফেসরের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।'

বাঙালি এখন নারীমুক্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিয়ে সরব বাঙালি লেখিকাকে এক কাপড়ে বিদায় করে। তাঁর স্থান হয় জয়পুরে। সাহিত্য সংস্কৃতির রাজধানীর দাবিদার কলকাতার অনেক আগেই লিটারেচার ফেস্টিভাল হয় সেখানে। বিষ্ণুপুর উৎসবের ধারণাও আমরা খাজুরাহো, কোণারক উৎসব দেখে শিখেছি।

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শিক্ষালয়ে ২২২ দিন কর্মদিবস সুনিশ্চিত করার উদ্দেশে সাহসী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। বাংলা চলছে তার বিপরীত দিকে। এখানে বোধ হয় এটা বহু শতাব্দীর মনীষীর কাজ। জনবিন্যাসের কঠিন যে সত্যে সারা বিশ্ব আজ চিন্তিত। এদেশে বেআইনি অনুপ্রবেশ যে কী ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনছে তা নিয়ে গত ৮০'র দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল টি. ভি. রাজেশ্বর কাগজে লিখলে তখনকার সরকার তাকে বহুকথিত প্রচার বলে উল্লেখ করে। বর্তমান রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রী সেকথা বললে মুখ্যমন্ত্রী তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। এক্ষেত্রেও প্রতিবেশী অসম সরকার আমাদের পথ দেখাচ্ছে। যেটা সবচেয়ে উদ্বেগের তা হলো আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বর্তমান বাংলার আর্গুমেন্টেটিভ মনীষীরাও এই জরুরি বিষয়টার প্রতি সচেতন ভাবে উদাসীন থেকে অচেতন আত্মহননের পথ মসৃণ করছেন।

আওয়ামি লিগ এবং বি এন পি দুই-ই এখন সংখ্যালঘুদের কাছে শঙ্কার কারণ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক হেফাজতে ইসলাম এখন বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানে রাজার আসনে। উগ্র ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার জন্যে ইতোপূর্বে মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হেফাজতের বাজার দর হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামি লিগের কাছে। তাদের দাবি মেনে আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যসূচি ইসলামি ধারায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। হিন্দু লেখকদের অনেক লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মিলেছে কওমি শিক্ষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেফাজতের শীর্ষ নেতা আল্লামা শাহ আহমেদ সফিসহ অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গণভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকেই দাওরায়ে হাদিস-এর মাস্টার্সের সম্মান নিয়ে ঐকমত্য হয়ে ৪৮ ঘণ্টা না পেরোতেই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যায়। হাসিনার সঙ্গে হেফাজত নেতাদের এই ‘ঐতিহাসিক’ বৈঠকের পর মন্ত্রীরা হেফাজতের প্রশংসায় মুখে ফেনা তুলছেন।

২০১৩ সালের ৫ মে নারীর সমান অধিকার বাতিলসহ ১৩ দফা দাবিতে হেফাজতে ইসলাম মতিঝিলে শাপলা চত্বরে অবস্থান নিয়েছিল এবং শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়েই ঘরে ফিরে যাবেন বলে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলেন নেতারা। এই ঘোষণা সমর্থন করে মতিঝিলে হেফাজতের এসে বক্তব্য দিয়েছিলেন বিএনপি ও জামায়াত নেতারা। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সরকারের পতন ঘটিয়েই ঘরে ফিরতে হবে। এক পর্যায়ে হেফাজতিরা গোটা ঢাকা শহরে তাণ্ডব চালায়। বহু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করে, দোকানপাটও পুড়িয়ে দেয়, সড়ক দ্বীপে গাছপালা উপড়ে ফেলে, রাস্তাঘাটের ক্ষতি করে। নারী সাংবাদিকদের

লাঞ্ছিত করা হয়, বইয়ের দোকানে অগ্নিসংযোগ করায় কোরআন শরিফও পুড়ে যায়। পরে অর্থমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছিলেন, হেফাজতিদের তাণ্ডবে ২০টি ব্যাঙ্ক ও দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৪ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হেফাজতিদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে হটিয়ে দেয়। আইন-শঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে বহু হেফাজত নেতা-কর্মীর প্রাণহানি বলে দাবি করেছিলেন হেফাজত নেতারা। সেই ঘটনার পর তিন বছর না গড়াতেই আওয়ামি লীগ- হেফাজত সখ্য এক নতুন যুগে প্রবেশ করলো।

মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে বহু সমালোচিত হেফাজতের ১৩ দফা দাবির মধ্যে কী ছিল? দাবিগুলো একবার দেখা যেতে পারে। (১) সংবিধানে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা’ স্থাপন। কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী সকল আইন বাতিল। (২) আল্লাহ, নবি মোহম্মদ ও ইসলাম এবং মুসলমানদের সমালোচনার সর্বোচ্চ শাস্তি

“সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সমাজ, যারা বরাবরই আওয়ামি লিগকেই ভোট দিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে এই পরিস্থিতি নতুন শঙ্কা তৈরি করেছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ ক্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেছেন, যে কারণে বিএনপিকে সংখ্যালঘুরা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন একই কারণ তৈরি হয়েছে আওয়ামি লিগ নিয়েও।”

মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে সংসদে আইন পাশ। (৩) স্বঘোষিত নাস্তিক ও ব্লগার, যাদের নেতৃত্বে শাহবাগ আন্দোলন, যারা নবির বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করেছেন তাদের কঠোর শাস্তি বিধান। (৪) স্বাধীনতার নামে বিদেশি সংস্কৃতির চর্চা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং প্রদীপ প্রজ্বলন বন্ধ করতে হবে। (৫) ইসলামবিরোধী নারী নীতি ও শিক্ষা নীতি বাতিল করে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৬) সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের (আহদিয়া) অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের সকল প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। (৭) সারা দেশে রাস্তায়, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করতে হবে। (৮) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশে মসজিদগুলোতে অবাধে নামাজ ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চালাতে দিতে হবে। (৯) সংবাদমাধ্যমে ধর্মীয় পোশাক ও সংস্কৃতির ভুল ব্যাখ্যা করে তরুণদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা বিস্তারের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। (১০) বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) জনবিরোধী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। (১১) আলেম-ওলামা, নবিজীর অনুসারী ও তৌহিদি জনতার ওপর হামলা বন্ধ করতে হবে। (১২) কওমি মাদ্রাসা, ইসলামি পণ্ডিত, ইমাম খতিবদের বিরুদ্ধে হুমকি বন্ধ করতে হবে। (১৩) গ্রেপ্তারকৃত ইসলামি পণ্ডিত, মাদ্রাসা ছাত্র ও তোহিদি জনতাকে মুক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা তুলে নিতে হবে। (এখানে ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশ ও অবরোধ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেপ্তার সম্পর্কে বলা হয়েছে।) এখন হেফাজত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাদের দাবি পেশ করতে তাতেই সরকার মেনে নিচ্ছে। সর্বশেষ দাবি, সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থপিত গ্রিক ভাস্কর্য সরিয়ে দিতে হবে। 'ইসলামি দেশে' এসব মূর্তি-ভাস্কর্য চলবে না। দাবি মাত্রই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেনে নিয়েছেন। তিনি প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে এই ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলতে বলেছেন। আইনমন্ত্রী বলেছেন, এখানে ভাস্কর্য স্থাপনের সময় সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। অর্থাৎ হিন্দু প্রধান বিচারপতির দিকেই 'ইসলামি অস্ত্র' তাক করা হয়েছে। পুরো দায় চেপেছে প্রধান বিচারপতির ওপর। এর মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে অপসারণের দাবিও উঠেছে হেফাজত-সহ ইসলামি শিবির থেকে। তাদের যুক্তি, মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিন্দু হতে পারেন না। হেফাজতে ইসলামের আমির ও চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে দারুল উলুম মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফিকে সরকার সেই হাটহাজারিতে রেলওয়ের মূল্যবান ৮১ শতক জলাশয় দিয়ে পুরস্কৃত করছে। এই মাদ্রাসার দখলে রয়েছে আরও ১ দশমিক ৩১ একর কৃষিজমি। আর ধানীর শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামির সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর হামলা, সড়ক অবরোধ ও হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় হেফাজতের দশ শীর্ষ নেতা ৩৯৯ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নেতা- কর্মীদের বিরুদ্ধে ৫৩টি মামলাও দায়ের করা হয়। দু'বছর পর ঢাকায় তিনটি ও চট্টগ্রামে একটি মামলার চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। বাদবাকি মামলার তদন্তে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এখন মামলার গোটা প্রক্রিয়াই স্থবির হয়ে গেছে। কারণ হেফাজতে সরকারের বন্ধু।

বিএনপির জানি দোস্ত জামায়াত। এখন আওয়ামি লিগের 'বিশ্বস্ত মিত্র'। জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামির মধ্যে কোনো বড় পার্থক্য নেই। একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে হত্যা, লুটপাট ও হিন্দু নিধনে অংশগ্রহণ করেছিল জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, লিগ ইত্যাদি। আজকের হেফাজত সেই নেজামে ইসলামিরই পরিবর্তিত রূপ। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামায়াতের বিচার হলেও নেজামে ইসলামি রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ সরকারের আশীর্বাদ রয়েছে তাদের ওপর। আওয়ামি লিগের নতুন মিত্র হেফাজতের মুখপাত্র কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে এক টক-শোতে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ একজন হিন্দু কবি, তাঁর 'আগুনের পরশমণি' গান গেয়ে রমনার বটমূলে ছায়ানট নববর্ষের যে উৎসব করে তা আসলে হিন্দুয়ানি একটা ব্যাপার। আগুনের পরশমণি মানে তো অগ্নি-উপাসনা। মহানবির একজন ক্ষুদ্র সেবক হিসেবে যে-কোনো ধরনের এই হিন্দুয়ানি ঠেকানো আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। তিনি টক-শোতে তিনটি দাবি করেছেন, হাইকোর্টের সামনে থেকে গ্রিক দেবীর মূর্তি সরাতে হবে, নববর্ষের আনন্দ শোভাযাত্রা বন্ধ করতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। মুখপাত্র আরও বলেছেন, হিন্দুয়ানি আছে এমন কোনো কিছু এদেশে চলবে না। সকালে ভোরের সূর্যের আলোর মুখ দেখে নববর্ষ পালন— এতো হিন্দুদের কাজ। এটা বন্ধ করতে হবে। মঙ্গল শোভাযাত্রায় ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে, একে অপরের মুখে ছবি এঁকে দেয়। এসব বন্ধ করতে হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি, তাকে এদেশে নিষিদ্ধের তালিকায় রাখা উচিত। উল্লেখ্য, পাকিস্তান শাসকেরা ষাটের দশকে এই যুক্তিতেই রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করেছিল।

জামায়তে ইসলামি অনেক দিন ধরে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করে আসছে। এবার আওয়ামি মিত্র হেফাজতও একই দাবি জানালো। আওয়ামি লিগ কী বলে, এখনো জানা যায়নি। কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সমাজ, যারা বরাবরই আওয়ামি লিগকেই মূলত ভোট দিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে এই পরিস্থিতি নতুন শঙ্কা তৈরি করেছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ ক্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেছেন, যে কারণে বিএনপিকে সংখ্যালঘুরা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন একই কারণ তৈরি হয়েছে আওয়ামি লিগ নিয়ে। এখন পরিষদকে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে। ∎

আমাদের বুদ্ধিদাতারা সেকাল-একাল

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গপ্রদেশে (তখন অখণ্ড বঙ্গ) যাঁরা লেখালেখি করতেন তাঁদের মধ্যে ভারতপ্রেমের ধারা প্রবাহিত ছিল। রাষ্ট্রবোধে তারা আলোকিত ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হয়ে অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান তিথির আগে পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের লেখনিতে ভারতবর্ষের দর্শন ও সনাতন ধর্মের শিক্ষার প্রতি আস্থা ছিল। তাঁরা এক সুন্দর ধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবজাগরণের সময় ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও তাঁরা ভারতবর্ষকে ও সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতিকে মনের ভিতর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। তাকে রক্ষা করার এক আকুতি সর্বসময় খুঁজে পাওয়া গেছে তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ সর্বত্র। তাঁরা বুদ্ধিজীবীর নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজিত ছিলেন। আদর্শ মহামানব ছিলেন তাঁরা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো গুণী, জ্ঞানী, মানী মান্যবর লেখক ও বিজ্ঞানীদের সাধারণ বাঙালির মানসিকতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ছিল। সেই মেলবন্ধনের প্রয়োজন রয়েছে। সে উপলব্ধির মধ্যে তাঁদের ফাঁকি ছিল না।

ভারতবর্ষের সনাতন ধারাকে অস্বীকার করার কোনো দুঃস্পর্ধা তাঁরা দেখাননি। তাই স্বাধীনতার পূর্বের মহামানবদের ও ঋষিতুল্য পণ্ডিত প্রবরদের প্রতি সাধারণ মানুষ আজও শ্রদ্ধাশীল। শত চেষ্টা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও সম্ভব হয়নি। নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠাকে মিলিয়ে তাঁরা সমাজকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অপরকে শোনার চেয়ে বোঝার চেষ্টা ছিল প্রবল। ভদ্রতার লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম না করে মতপ্রকাশের ধারাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শব্দ ব্যবহারেও মার্জিত ভাব ধরে রেখে নান্দীক ও নিজস্ব শৈলীকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ছিল। বাংলার নাটকেও ভক্ত ভৈরব গিরীশচন্দ্রের প্রবল প্রতাপ অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। পরবর্তীকালে বামপন্থী নাট্যকাররা গিরীশ ঘোষকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা সাধারণত যাঁকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ধারা বলি সেই ধারার শিকড় ছিল সুদূর প্রসারিত। কিন্তু বাম জামানায় তাকে উপড়ে ফেলার সমস্ত চেষ্টা হয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে।

ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই ক্ষমতা নেহরুবাদীদের হাতে আসে। পশ্চিমের প্রতি গুণমুগ্ধ এই নেতৃত্বের পূর্বের ধারা সম্পর্কে ধারণাই ছিল সীমাবদ্ধ। এঁদের সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ ও তার আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছিল অনীহা। ভারতবর্ষের ‘হিন্দু’ ভাবধারাকে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাকারী, বিগত দিনের কুসংস্কার বলে ভুলিয়ে দিয়ে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন নিরীশ্বরবাদীরা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীকুল। উদারবাদী ও বামাচারীরা একত্রিত হন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ধারাটিকে শুকিয়ে দেবার ও অস্বীকার করার অপচেষ্টায়। পশ্চিমমুখী ভাবধারায় পুষ্ট এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রায় অপরিচিত এই বুদ্ধিজীবীরা ভারতবর্ষকে পশ্চিমের উদারবাদী দৃষ্টিতে ও বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা শুরু করেন। সমস্ত রাষ্ট্রবাদী লেখা ও ভারতীয় পরম্পরায় শ্রদ্ধাশীল যুক্ত লেখা যাতে কোনো বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত না হয় সেই ষড়যন্ত্র রচিত হয়। বড় বড় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বৌদ্ধিক সংস্থাগুলির মাথায় নেহরুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীদের বসানো হয়। আমলাকুল যা ব্রিটিশ যুগে সাহেবভক্ত ছিলেন তাঁদেরই উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকেই একটু ঘষা-মাজা করে চলানোর চেষ্টা হলো। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্যার যদুনাথ সরকারের বইগুলো না থাকলে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস আজ খুঁজে পাওয়াই কঠিন হতো। রমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, তপন রায়চৌধুরী, এস. গোপাল ও তাঁদের সমমনোভাবাপন্ন ঐতিহাসিককুল আমাদের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ‘হোয়াইট ওয়াশ’ করতে নামলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে

১৯৬৬ সালে রমিলা থাপার লিখেছিলেন, ‘আর্যরা উত্তরপূর্ব ইরান অথবা কাসপিয়ান সাগর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিল।’ পরে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব যখন ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো তখন তিনি স্রেফ একটি ‘সম্ভবত’ জুড়ে দিয়ে দায় সারলেন। অর্থাৎ, ‘আর্যরা সম্ভবত উত্তরপূর্ব ইরান অথবা কাসপিয়ান সাগর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিল।’

দেখার নামে ইতিহাসকেই বিকৃত করা শুরু হলো। আজ যাঁরা শশব্যস্ত হয়ে গেরুয়াকরণ বলে প্রবল চিৎকার জুড়েছেন তাঁরা সবুজকরণ ও লালকরণের সময় মৌন ছিলেন। এখনও মোদীজীর সরকার কোনো উচ্চ সারস্বত সাধনার পদে পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রম না হলে পূর্বতন সরকারের দ্বারা মনোনীত কাউকে সরাননি। এমনকী অনেক পদে আগের সরকারের বসিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীরা 'এক্সটেনশান' পেয়ে কাজ করছেন। ৭০ বছরের মৌরুসিপাট্টায় হাত পড়লেই সমমনোভাবাপন্ন বাম-উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন হাতে থাকা প্রচারমাধ্যমকে লেলিয়ে দিয়ে সরকার বিরোধী মনোভাব তৈরি করার চেষ্টা করছে। এখনও তাঁদের মনোভাবাপন্ন শিল্পী সাহিত্যিকরাই পুরস্কৃত হচ্ছেন। সেই পুরস্কার কে পাবেন ঠিক যাঁরা করেন সেখানে বাম ও উদারবাদী দর্শনে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। সরকার পরিবর্তন হলেও এই ৭০ বছরের ব্যবস্থার বিশেষত বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যা জাঁকিয়ে বসে আছে তার পরিবর্তন সহজে হয় না।

স্বাধীনতার আগে বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রচলন থাকলেও পারিবারিক বন্ধন ও যৌথ পরিবারের ধাঁচাটা তখনও থেকে গিয়েছিল। ফলে দেশের প্রতি টানটা পরিবার থেকেই গড়ে উঠত। দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত, যৌথ পরিবার প্রায় বইয়ের পাতায় চলে যাওয়ার ফলে দেশমাতৃকার সঙ্গে বাঁধনটাই আলগা হয়ে গেল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দেশজুড়ে কদর ছিল। তাঁদের শ্রদ্ধার আসনটা নবজাগরণের সময়ে তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্বের সারস্বত সাধকদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার ভাবকে কাজে লাগিয়ে নব কলেবরে যে নেহরুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীকুলের উদয় হলো তাঁরা অতীতের ঋষিতুল্য মহামানবদেরই অস্বীকার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পূর্ণ চেষ্টা চালালেন। ভেবেছিলেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিদেশের স্নেহচ্ছায়া, আধুনিকতার জোয়ার, ভোগবাদের উত্থান, সমাজবাদের প্রতি টান এসব তাঁদের এতই সাহায্য করবে যে ভারতবর্ষকে তার সনাতন অতীত থেকে চিরকালের মতো বের করে আনতে পারবে। মধ্যযুগে এ চেষ্টা হয়েছিল

'ভারতমাতা মোটেই ভারতীয় নন। এই ভাবনাটি ইউরোপ থেকে আমদানি করা হয়েছিল।'

— ইরফান হাবিব

অত্যাচারের মাধ্যমে। ব্রিটিশ যুগে সেই চেষ্টাই চলেছিল চতুরভাবে। এবার নেহরু যুগে এই চেষ্টা শুরু হলো পেট্রোডলার, ইউরো-ডলার, সরকারি সাহায্য সব নিয়ে সংগঠিত ভাবে। অদৃষ্টে হেসেছিলেন সৃষ্টিকর্তা। দেবভূমি, ঋষিভূমি এই ভারতবর্ষকে যে সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজ হাতে রক্ষা করেছেন তাকে কিছু চতুর ষড়যন্ত্রী বিপথে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে দেবে তা হয় কি? স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিরোধ গড়ে তুললেন হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা। পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক (ড.) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিলেন সেই প্রক্রিয়ার। স্বামী প্রণবানন্দ বরণ করে নিলেন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদকে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রশিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর) এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। ভগবান যেন নবযুগে সাজিয়ে তুললেন তার নবীন নেতাকে। স্বামী প্রণবানন্দ দিলেন তাঁর সাধনালব্ধ ধীশক্তি, শ্রীগুরুজী দিলেন তাঁর স্নেহ ও সঙ্ঘশক্তির সহযোগিতা, শ্যামাপ্রসাদের নিজের ছিল অসীম জ্ঞানশক্তির ধারা। এই সেই তিন শক্তি একত্রিত হয়ে এক প্রবল প্রতাপশালী হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা শুরু হলো। নেহরুবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের বাধা যত প্রবল হলো হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিরোধও প্রবলতর হতে লাগল। নেহরুবাদীদের অর্থশক্তিকে রুখে দিল সঙ্ঘের সাধনালব্ধ সঙ্ঘশক্তি। সময় লাগল ৭০ বছর। আজ তাঁরা সমানে সমানে সমরে উপনীত। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরব। শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম রক্ষাকারীদের সঙ্গে দ্বাপরে ছিলেন, কলিতেও অন্যথা হবে না। ভারতবর্ষকে দুরাত্মারা ভারতাত্মা থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারবে না। ভারতবর্ষের হিন্দুত্ববাদীরা সেটা কোনোদিন হতে দেবে না। ভারতবর্ষকে ইন্ডিয়া থেকে মহাভারতের সাধনায় ফিরিয়ে আনার যাত্রা শুরু হয়েছে। ভারতবাসী প্রাণের টান অনুভব করছে। দীর্ঘ শীতঘুমের পর সনাতন সমাজ জেগে উঠছে। জাতিভেদ ভুলে হিন্দু তার আসল পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতের ভাবগুলি আবার আন্দোলিত করছে মানুষকে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের ঢেউ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে না। ভারত মা অপেক্ষা করছেন। নিজের মা ও দেশ মা একাকার হয়ে যাচ্ছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত ব্রজেনশীল, বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবার হৃদিমন্দির জুড়ে বসছেন। ভারত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতকে অনুসরণের জন্য তৈরি হচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বুদ্ধিজীবীদের পাতা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি ঋষিতুল্য মহামানবদের লেখা পড়ুন ও ব্যাখ্যাটা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে রাঙিয়ে নিন। স্বাধীনতার পরের কলমচিদের লেখায় স্বাধীনতার পূর্বের মহামানবদের ব্যাখ্যা পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। সেটা বহু ক্ষেত্রেই যে অপব্যাখ্যা সেকথা ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আগামীদিনে আমরা স্বাধীনতা-পূর্বের ঋষিতুল্য মহামানবদের মনে রাখব ও বর্তমানকালের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হারিয়ে যাবেন স্মৃতির অন্তরালে। কীভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ও পুরস্কৃত হয়েছেন সে কথাও কালের নিয়মেই প্রকাশিত হয়ে যাবে। সরকারের আনুকূল্যে যে বুদ্ধিজীবীকুলের উদয় তাঁরা সরকার নির্ভর।

ফলে তাঁদের কালজয়ী হবার সম্ভাবনা খুব কম। মানুষের অভিজ্ঞতাকে হার মানিয়ে বানানো কথা কয়েকদিন চলে, চিরকাল চলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বুদ্ধিজীবীকুলের কুলপতিরা বিদেশে গিয়ে পড়াশুনায় মন দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশে বিশেষত তখন আমেরিকা নয় বিলেত বলতে ইংল্যান্ডে যাবার চল ছিল বেশি যা পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় যাবার ইচ্ছাতে পরিণত হয়। কালের নিয়মে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের তুলনায় সুযোগ সুবিধা আমেরিকায় বেশি থাকায় সেখানে যাওয়ার চল বাড়ে। ইংল্যান্ড ও ইউরোপে রাষ্ট্রবাদের চেয়ে উদারবাদী ধারার চয়ন, মনন অধ্যয়ন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। কারণ রাষ্ট্রবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফ্যাসিবাদকে ডেকে আনলে ইউরোপের দেশগুলির অস্তিত্ব সঙ্কট উপস্থিত হবে। ফলে উদারবাদ বিশ্বের বুদ্ধিজীবীকুলের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে তার মেলবন্ধনের চেষ্টার চেয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচার প্রসারের উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে রাষ্ট্রবাদের উত্থানের ফলে, তাই সেই দর্শনকে সে বরণ করে নেবে সেটা অস্বাভাবিক। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে রাষ্ট্রবাদের তুলনায় উদার ও আন্তর্জাতিকতাবাদ অনেক গ্রহণীয়। তাঁদের নয়া-ধনতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার পথে তারা সহায়ক দর্শন চাইছিলেন। এই দর্শনের ফলে যে সামাজিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে তার ফলে ডান ও বাম দু-দিক থেকেই ঠেকা দিতে হবে। এরই ফলস্বরূপ অপর ইউরোপীয় দর্শন আন্তর্জাতিকতাবাদে পুষ্ট মার্কসবাদের ব্যাপ্তি হতে থাকল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বুদ্ধিজীবীরা উদারবাদ, মার্কসবাদ ও উভয়ের কাছে গ্রহণীয় আন্তর্জাতিকতাবাদে দীর্ঘ ৭০ বছরের বেশি সময় বুঁদ হয়ে রইলেন। সংস্কারিত না হয়ে সর্বকল্যাণের কথা বললে যা হয় তাই হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৫০ বছরের মধ্যে মার্কসবাদ নিয়ে মানুষের মোহভঙ্গের পর্ব শুরু হলো। তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা আর সাধনার মাধ্যমে সেবা সর্বসাধারণকে পৌঁছে দেওয়া এক নয়। সন্দেহ, ঈর্ষা, লোভ, দ্বেষ সকলই গ্রাস করল সংস্কার রহিত সমাজতান্ত্রিক

'ভারতীয়ত্বের ধারণাটি ব্রিটিশদের সৃষ্টি। এর কোনো সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নেই। একই কথা বলা চলে হিন্দুত্ব সম্পর্কেও।'
'এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংস হয়েছিল হিন্দু রাজাদের অসহিষ্ণুতার জন্য।'
— বিপান চন্দ্র

প্রচারকদের। প্রাথমিক মোহ ভেঙে গেল বিশ্বের। একের পর এক দেশে পতন হলো তাঁদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের। উদারবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তি সমাজতান্ত্রিকদের উত্থানে ভীত হয়ে সাহায্য করতে লাগল অতি দক্ষিণ শক্তিকে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ধর্মকেন্দ্রিক অতি দক্ষিণ মৌলবাদী শক্তির সাহায্য গিয়ে সমাজতান্ত্রিকদের উত্থান রোধ করা হলো। আবার অতি দক্ষিণ মৌলবাদী শক্তির উত্থান মাত্রা ছাড়ালে সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে নিয়ে অতি দক্ষিণ মৌলবাদীদের লক্ষ্মণরেখার মধ্যে রাখা। এই ধারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের রাজনীতির গতিকে পুষ্ট করেছে আর বুদ্ধিজীবীরা মেধা শক্তিকে সেই মতো কাজে লাগিয়ে বিত্তের কাছে বৃত্তিকে বিক্রি করে বন্ধক রেখে গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলার রীতি নিয়েছে। ভারতবর্ষও সে পথের পথিক হয়েছে নবকালে। সময় এসেছে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সনাতন সংস্কার বুঝে এই খেলা থেকে বেরিয়ে প্রাচীন ভারতে যেমন বোধের উপর বুদ্ধির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকে অনুসরণ করা। বাম-ডানের ইউরোপীয় ঘরানার বাইরে গিয়ে একাত্ম মানবদর্শনের ভারতীয় ঘরানার মধ্যে প্রবেশ করার। ভারতবর্ষের বুদ্ধি বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের সাধনা— শ্রীঅরবিন্দের গীতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঈশোপনিষদের উপলব্ধি। নিরপেক্ষতার অভাব থাকে তখনই যখন বোধের বোধন হয় না। পক্ষপাতিত্বই প্রলয় ডেকে আনে। স্বাধীনতার পর ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি এবং বুদ্ধিজীবীকুলও তাকে পুষ্ট করার জন্য সবরকম সাহায্য করাই প্রতিস্পর্ধী রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর বিচার করব অথচ বিশ্বের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে হিন্দু যে ১৪ শতাংশ সেই বিপন্নতাবোধকে গুরুত্ব দেব না— এ এক দ্বিচারিতা। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গলা তুলব, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করব কিন্তু ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদকে অস্বীকার করব— একে শুধু ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়! বাংলার কথা দিয়েই শেষ করি। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে হিন্দু বাঙালির মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৫০ লক্ষের মতো সেখানে মুসলমান বাঙালির মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষের কাছাকাছি। এরই জন্যে বাংলার লেখকরা বাংলা পাঠকের বাজার বুঝে ৩০ শতাংশ হিন্দু বাঙালির থেকে ৭০ শতাংশ মুসলমান বাঙালির মন জুগিয়ে লেখেন। তাই দেশভাগের কারণ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বহু বই লেখা হলেও গুটিকয়েক কথা লেখা থাকে বাংলাদেশে হিন্দু নিষ্কাশন নিয়ে। কী কারণে হিন্দু জনসংখ্যা বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার সময়ে থাকা ৪৬ শতাংশ আজ প্রায় ৩০ শতাংশ কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে তা নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায়। সত্য গোপন করলে তা প্রকাশিত হতে দেরি হয় কিন্তু হারিয়ে যায় না। তাই অভিজ্ঞতায় আলোকিত হয়ে শিখুন সত্যকে চিনতে। বুদ্ধিজীবীকুল নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য নগদ নারায়ণে আস্থা রেখে ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই, সেখানে ভগবানই ভরসা। ■

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভুল বুঝবেন না প্লিজ!

ড. জিষ্ণু বসু

সারা ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিল বাংলা ও বাঙালি। রাজনারায়ণ বসু প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পাথেয় করে লিখেছেন। তাঁর বই মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল যে যুবকের, তার নাম নবগোপাল মিত্র। শুরু হলো হিন্দু মেলা। জ্বলে উঠল প্রদীপ। আচ্ছা, রাজনারায়ণ কিংবা নবগোপাল কি বুদ্ধিজীবী ছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখলেন, সারা ভারতের মানুষ শুনল বন্দে মাতরম্ গান। ঋষি অরবিন্দ ওই 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় মন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন প্রথম ভারতমাতা প্রতিকৃতি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, এই ভারতমাতার চিত্র নিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী যাত্রা করতে যাতে দেশের যুবকেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। বাল্যবিধবা মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষা সম্মানের জন্য বিদ্যাসাগর জীবনপাত করলেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করালেন। আর্তের সেবা করে, 'বিদ্যারসাগর যিনি বিখ্যাত ভারতে' তিনি কবে যে 'করুণার সিন্ধু' হয়ে উঠলেন। আচ্ছা বঙ্কিম, অরবিন্দ, বিদ্যাসাগর এঁরা কি কেউ বুদ্ধিজীবী ছিলেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত পড়াশুনাটাও ঠিকঠাক হয়নি। অথচ সারা পৃথিবীকে শোনালেন ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী, অমৃত জীবনরচনা আর দেশ-কাল-ধর্ম ভাষার ঊর্ধ্বে সার্বজনীন সাংস্কৃতিক কথা। বিদ্রোহী কবি দুঃখুমিঞা নজরুল যেন বাঙালির বড়ো আপন, বড়ো একান্ত নিজের। 'আনন্দময়ীর আগমনে' লিখলেন ধূমকেতু পত্রিকায়। পত্রিকা তো বাজেয়াপ্ত হলোই কবিও কারান্তরালে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইস্কুল ফেল রবীন্দ্রনাথকে স্নাতক স্তরের ক্লাস নিতে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দিলেন বাংলায়। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ নজরুল বা শ্যামাপ্রসাদ কি বুদ্ধিজীবী ছিলেন?

এইসব ক্ষণজন্মা মানুষেরা লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, আইনজীবী, বিচারক, অধ্যাপক, কেউ বা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামটাই তাদের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছিলেন। অনেকেই মা সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। স্বীয় ভাব প্রকাশের জন্য, প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে, সমাজ সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। কখনো বা স্বামী বিবেকানন্দের মতো কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত নবজাগরণের জন্য উজ্জীবনী ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু এঁরা কখনো কোনো প্রসঙ্গেই নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলেননি।

মার্কসীয় শ্রেণীচেতনা দিয়ে দেখলে এই প্রবুদ্ধ, উদার, দেশপ্রেমিক সমাজকে কোনো একটি বন্ধনীতে ফেলা যাবে না। কেউ ছোট জমিদার বাড়ির, কেউ উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরীজীবী বা আইনজীবীর, কেউ বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কেউ বা ভূমিহীন মুসলমান কৃষক পরিবারের। এই অসম শ্রেণীচরিত্র, শিক্ষার স্থানের (স্কুলিং) তারতম্যের থাকার পরেও দেশের ঐতিহ্য সাংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, ভারতবর্ষের আপামর জনসমাজের জন্য এদের প্রাণ কাঁদত, তাদের সেবায় প্রয়োজনে নিজেদের দেহ-মন-ধন উৎসর্গ করতে পারতেন। এই বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ততটা নাম করা নন এমন হাজার হাজার মানুষ পূর্ববাংলা বা পশ্চিমবাংলায় ছিলেন। বরিশালের উল্লাসকর দত্ত যে প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে সদর হাভেলির ময়দানে ধরা পড়েছিলেন সেই প্রচারপত্র কে লিখেছিলেন কিংবা মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরাকে দেশপ্রেমের মন্ত্র কে দিয়েছিলেন— তাদের নাম হয়তো কেউ জানবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন আসে। শুরু হয় রেশন ব্যবস্থা। স্কুলের শিক্ষক চাকরি ছেড়ে ফুড করপোরেশনের কেরানির চাকরি জোগাড় করেন। তারপর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যান। ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন হলেও প্রতীকী। বঙ্গীয় আইন সভায় মুসলিম লীগ শাসনের সময় থেকেই বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসেবে তৈরি হওয়া মূল্যবোধ ভাঙতে শুরু করে। এর মধ্যে যোগ হয় দেশভাগের নিদারুণ যন্ত্রণা। বাংলা আর পঞ্জাব ভারতবর্ষের যে দুটি প্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল, দেশে স্বাধীনতালাভের দিনে সেই দুটি প্রদেশের মানুষের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়েছিল। ১৯৪৭ লালে যখন দিল্লিতে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের নেতারা ক্ষমতার মধুতে লুটোপুটি খাচ্ছে তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা থেকে আসা শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দু'বেলা দুমুঠো খাবার আর বাড়ির মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রতারণা পূর্ব থেকে পশ্চিম সমগ্র বাংলার ভদ্রলোকেদের মধ্যে প্রণম্য দেশনেতাদের প্রতি এক ঘৃণার ভাব তৈরি করে। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা জন্ম নেয়। আর এই শূন্যতার জায়গা কৌশলে দখল করে নেয় বামপন্থীরা। এক নতুন শব্দবন্ধ তৈরি হলো 'প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী'।

বুদ্ধিজীবীদের গুণকীর্তন করার আগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একটু পরিভাষা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। সরকারি আদমশুমারি বা তথ্যাদিতে পেশাগত ভাবে কোনো জনগোষ্ঠীকে 'বুদ্ধিজীবী' বলে উল্লেখ থাকতে পারে, ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের অবাংলাভাষী সাংবাদিক 'ইনটেলেকচুয়াল' শব্দের বাংলা 'বুদ্ধিজীবী' হিসেবে দেখতে পারেন, কিংবা অর্থনীতির অধ্যাপক সম্পদ বণ্টনের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এইসব ব্যাখ্যার বাইরে, 'কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী জন্মের নির্বাহবিলাসী' বাঙালিকুলকেই এই লেখায় 'বুদ্ধিজীবী' বলে উল্লেখিত হলো। বঙ্কিমচন্দ্রের

'বাবু' প্রবন্ধের থেকে ধার নিয়ে বলা যায়, 'যাহারা ইহার অন্য অর্থ করিবেন তাহারা গোজন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধিজীবীদের ভক্ষ্য হইবেন।' ভাবতে অবাক লাগে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ সালে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার ১৩০ বছর পরে ২০১৬ সালে কলকাতার রাস্তার দুই স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীকে দেখা গেল প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণের বীরত্ব দেখাতে। বাস্তবিকই সাহিত্য সম্রাট ক্রান্তদর্শী ছিলেন।

স্বাধীনতার পরে অনেক প্রতিভাবান মানুষ বামপন্থায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'যাবে খোল নলচে বদলে, বিচার করবে নীচু জনে' এমন গালভরা কথা যে ১৮-১৯ বছরের ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই সত্তরের দশক পর্যন্ত অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন, তরুণ প্রতিভা বামপন্থী ভাবধারাতে সম্পৃক্ত হয়ে সাহিত্য, শিল্পকলা রচনা করেছেন। তার সবটাই যে পার্টি সাহিত্য তাও নয়, তবে শ্রেণীচেতনা, বিপ্লব, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র এসেছে ঘুরে ফিরে। মাঝে মাঝেই ভারতবর্ষের শাশ্বত সংস্কৃতির ঢেউ আছড়ে পড়ে ধুয়ে দিয়েছে মেকী প্রগতিশীলতার তাসের ঘর। কিন্তু পার্টি সজাগ থেকেছে সর্বদা। তৈরি করেছে অদ্ভুত সব যুক্তি, গণনাট্য সঙ্ঘ। 'আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই' গাইতে পারবে, কারণ ওটা লোকসংস্কৃতি। কিন্তু সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কোনো গানে হিন্দু দেবদেবীর নাম নিতে পারবেন না, আস্তে আস্তে এমনই তৈরি হলো 'পার্টিলাইন'। ঋত্বিক ঘটক নিজে নিষ্ঠাবান নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে গালাগালি দিয়ে প্রতিবাদ করতেন এইসব ভণ্ডামির, বলতেন— একটা হাজার হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতার কোনো ছাপ থাকবে না আজকের শিল্পে? তারপরেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সেই বিশেষ গালি।

সংবাদমাধ্যমের প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক অসাধারণ অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র অবস্থা থেকেই বামপন্থা বা অতিবামপন্থার প্রতি গভীর আস্থা তাদের সংবাদমাধ্যমে প্রবেশে সহযোগিতা করেছে। কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়াতে মালিক থাকেন না।, থাকেন ব্যুরো চিপ বা সম্পাদক। তারা দীক্ষিত প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী। কিন্তু একটু পরিণত হওয়ার পরে মালিকের সরাসরি নির্দেশ আসতে থাকল। তখন রাজ্য সরকারের এক একটি অসাধারণ প্রকল্প নিয়ে তাকে পাতার পর পাতা লিখতে হবে, তাতে শ্রেণীসংগ্রাম, এলাকা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি বিজাতীয় দ্রব্য থাকলে চলবে না কিংবা লোকের রসনার তৃপ্তির জন্য নগ্নতা, বিকৃতি বা নিপাট কুসংস্কার দিয়ে কাগজের পাতা ভরাতে তাদের বিন্দুমাত্র ভাবতে হয় না। তার বদলে এরা মাইনের সঙ্গে সঙ্গে মোটা পার্কস (মালিক ও তাদের উভয়েরই কর ফাঁকির ব্যবস্থা), বিদেশ ভ্রমণ, দামি গাড়ি, বাড়ি হচ্ছে। কিন্তু দেশের সর্বহারা মানুষের সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে, কিংবা সুকমায় সি আর পি এফ জওয়ানদের নারকীয় হত্যার সমর্থনে পাতা ভরিয়ে দেবেন। আসলে নিপাট ভোগবাদী এইসব বুদ্ধিজীবীর স্টাইল স্টেটমেন্ট হলো, 'অতিবামপন্থা'।

কলকাতার এই বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতরতার এক অভিনব নীতিমালা বানিয়েছেন। গোধরায় দাঙ্গার ঘটনা সত্যি মিথ্যা মিশিয়ে বড় বড় ছবি দিয়ে 'স্টোরি' তৈরি করে খবরে কাগজের প্রথম পাতায় সগৌরবে ছাপানো যায়। তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। দাদরির ঘটনার পরে টানা সাতদিন ধরে প্রথম পাতায় আর তারপরে পনেরদিন ধরে উত্তর সম্পাদকীয় কলমে লিখলে 'আগুনে ঘি দেওয়া' হয় না। কিন্তু বাংলাদেশে ভয়াবহ দাঙ্গার বিষয়ে একটি লাইনও লেখা যায় না। মালদা জেলার কালিয়াচকের মতো ঘটনাকে যে সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া যায় সেটা বাংলা সংবাদপত্রের বুদ্ধিজীবীরা করে দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে ২০০২ সালের দাঙ্গার ধর্ষিতা হয়েছিল পূর্ণিমা শীল। ১৪ বছরের মেয়েটিকে ১৪/১৫ জন দুষ্কৃতী দিনরাত ধর্ষণ করেছে। সারা পৃথিবীর সাংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা নীরব ছিলেন। গত বছর দুর্গা পূজার সময় নদীয়া জেলার হাঁসখালিতে ১৭ বছরের স্কুল ছাত্রী মৌ রজকের উপর অত্যাচার করল মৌলবাদীরা। তপশিলি জাতির গরিব মেয়েটা ৪৮ বছরের ইমান আলির কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অ্যাসিড বাল্বের আক্রমণের পরে টানা ১০ দিন কলকাতায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিভে গেল মৌ! পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মোমবাতি নিয়ে মিছিল করলেন না। কারণ তাহলে তারা জেহাদি মৌলবাদীদের কোপে পড়তে পারেন! কী লজ্জাকর কাপুরুষতা!

এই বুদ্ধিজীবীদের শুরুটা অবশ্যই বামপন্থা থেকে হয়েছিল। কিন্তু আজ তারমধ্যে না আছে 'নবান্নের' সমাজ সচেতনতা, 'কল্লোলের' সাহসী উদারতা; আবার 'উত্তর আধুনিকতা' গ্রহণের মতো নিঃস্বার্থ মানসিক বিস্তারও নেই। একমাত্র 'ধান্ধামূলক বস্তুবাদ' টুকুই এদের সম্বল। এক বুদ্ধিজীবী কবি গায়ক বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হলো এক ধরনের স্বপ্ন আমার তৈরি করি বিশ্বজুড়ে যৌথ খামার'। ভাল কথা! কিন্তু কালক্রমে তার বিদেশিনী স্ত্রীর প্রাপ্য মেটানোর ভয়ে নিজ ধর্ম, পিতৃদত্ত নাম সব পরিবর্তন করেছিলেন। অত্যন্ত বামপন্থী, সিপিআইএমের স্তাবক ভদ্রলোক কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগতেই পরিবর্তনপন্থী হয়ে গেলেন, সাংসদ হয়ে 'শূকরের খোঁয়াড়ে' ঢুকলেন। তারপর 'সারদা'র ধাক্কায় যখন দিদির আসন টালমাটাল তখন টুক করে সরে এলেন। 'সারদা' নিয়ে গান বাঁধলেন। দিদি, তৃণমূল সবকিছু থেকে দূরে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। যখন এগিয়ে থাকা প্রচারমাধ্যম, সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেসের উপমুখ্যমন্ত্রী খুঁজতে ব্যস্ত 'গানওয়ালা' ভদ্রলোক তার সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফল বের হলো। জেহাদি মৌলবাদের হাত ধরে দিদি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলেন। সেই বিজয় উৎসবে সেই বুদ্ধিজীবী লুঙ্গি আর ফেজ টুপি পরে উপস্থিত হলেন।

এই প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের জন্যেই পশ্চিমবঙ্গে মধ্য মেধা ও নিম্নমেধার আধিক্য হয়েছে। সারা ভারতে সব পরীক্ষায়, সব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসতে আসতে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে শেষ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার আজ পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ফতোয়ার শহর। কতিপয় উর্দুভাষীর ফতোয়াতেই চলছে আজ পশ্চিমবঙ্গ। আর তথাকথিত সুশীল সমাজ, প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা ক্ষমতার চিটেগুড়ে পাখাওয়ালা পিঁপড়ের মতো আটকে রয়েছে। ■

এই সময়

দ্বিমুখী চীন

সর্ষের মধ্যেই ভূত। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস্ জানাচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ নাকি দলাই লামাকে অর্থসাহায্য করছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তিব্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়াং ইয়ঙ্গুনকে উদ্ধৃত করে সংবাদপত্রটি এই খবর জানিয়েছে।

দুষ্কৃতী আঁতাত রোধে

দুষ্কৃতীদের আঁতাত রুখতে অভিনব উদ্যোগ যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। রাজ্য

পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি জি এল মীনা জানান, উত্তরপ্রদেশে যে ডনেরা এখনও জেলে বসেও অপরাধ জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের অন্য জেলে পাঠানো শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অপরাধীদের আঁতাত রুখতেই সরকারের এই উদ্যোগ।

ভি আই পি নয়, ই পি আই

সম্প্রতি মন কী বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে ভি আই পি মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ইপিআই

(এভ্রি পারসন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট বা প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ) মানসিকতায় অভ্যস্থ হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। ইতিমধ্যেই লাল বাতিওলা গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভিআইপি মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত মিলেছে।

কলকাতায় সক্ষম-এর সুরদাস জয়ন্তী

গত ৩০ এপ্রিল সাধক কবি সুরদাসের জন্মতিথি পালন করা হয় 'সক্ষম'-এর পক্ষ থেকে। কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং রাষ্ট্রীয় দিব্যাঙ্গজন চিকিৎসা ও শিক্ষা সংস্থার উপ অধিকর্তা (কারিগরী) ডাঃ রাকেশ ঝালানী, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত এবং পূর্বতন ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। উপস্থিত অতিথিগণ সাধক সুরদাস ও ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্প অর্পণ করেন।

সক্ষমের সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায় 'সক্ষম' বিষয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা বিজয় আঢ্য সুরদাসজীর জীবনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজকের দিনেও সুরদাসজীর জীবনী আমাদের কাছে প্রেরণাদায়ক। এর পরে ডাঃ ঝালানী কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা জারি করা নতুন দিব্যাঙ্গ বিধি বিষয়ে আলোচনা করেন। সক্ষমের দিব্যাঙ্গ কার্যকর্তা অধ্যাপক অরবিন্দ পাত্র এই বিষয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি অদ্বৈত চরণ দত্ত 'সক্ষম' গঠন করার ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় সঙ্ঘের তৎকালীন সহ-সরকার্যবাহ মদনদাসজীর অনুপ্রেরণা ও উপস্থিতিতে 'আত্মদীপ ভব' মন্ত্রে কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন বন্ধুদের জন্য সর্বভারতীয় সংগঠন দৃষ্টিহীন কল্যাণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে ওই সংগঠনের নবরূপে সকল প্রকার বিকলাঙ্গদের উন্নতির জন্য 'সক্ষম' ২০০৮-এর ২০ জুন স্থাপিত হয়। সক্ষম-এর শাখা সারাদেশে বিস্তৃত। এই সংস্থার নিজস্ব চক্ষু ব্যাঙ্ক 'মাধব নেত্র ব্যাঙ্ক' একাধিক স্থানে কাজ করছে। এই কাজে সকলের এগিয়ে আসা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। এর পরে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভা পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম উপাধ্যায়।

পুরীতে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার বৈঠক

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সর্বভারতীয় বার্ষিক কার্যকরী সমিতির বৈঠক গত ৮ ও ৯ এপ্রিল পুরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ড. নিখিলেশ গুহ, প্রদীপ চক্রবর্তী, অমিতাভ সেন, শ্রীমতী প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন নিয়োগী, বিনয় দাশ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

এই সময়

ঘুম পাড়াতে ওঙ্কার

দিভিনা ইসেনম্যানের বয়েস মাত্র ছ' মাস। তাকে ঘুম পাড়ায় কার সাধ্যি! ঘুমের নাম

শুনলেই মেয়ের কান্না শুরু হয়। তার কান্না থামাতে বাবা ড্যানিয়েল ইসেনম্যান ওঙ্কার আবৃত্তি করেন। ওম্ ধ্বনি কানে যাওয়া মাত্র দিভিনার কান্না থেমে যায়। ঘুমিয়েও পড়ে।

ব্রহ্মের সফল পরীক্ষা

ভারতের অস্ত্রভাণ্ডারের শক্তি আরও বাড়ল। সম্প্রতি পরমাণু শক্তি চালিত ভূমি থেকে ভূমি

ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মের পরীক্ষা সফল হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ব্রহ্ম সুপারসোনিক ক্রুজ মিসাইলের পর্যায়ভুক্ত। একে জাহাজ, সাবমেরিন, বিমান বা ভূমি— যে-কোনো জায়গা থেকে ছোড়া যায়।

নপুংশক পাকিস্তান

জম্মু ও কাশ্মীরে গত ২৭ বছরে পাকিস্তান ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

এর মধ্যে ২২,০০০ জঙ্গি এবং ৫,০৫৫ জন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের একটি সূত্র থেকে মিলেছে এই তথ্য।

কলামন্দিরে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

গত ৩০ এপ্রিল শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলকাতার কলামন্দিরে 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দি জগতের প্রখ্যাত গীতি-গজলকার এবং রাষ্ট্রীয় রচনাকার ড. শিব ওম্ অম্বরকে এবার ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত

করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ স্বান্ত রঞ্জনজী। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

মানিকচকে মাতৃসম্মেলন

গত ৩ মে মালদহের মানিকচকের কমলপুর পেট্রল পাম্প সংলগ্ন আমবাগানে একটি মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা ওই এলাকার কতিপয় ধর্মপ্রাণা মা-বোন। এই সভাকে ঘিরে মায়েদের উৎসাহ ও তাদের দলে দলে সভায় যোগদান করা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেদিন অপরাহ্ণে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভায় বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে দেশ গঠনে ধর্মপালনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। মাতৃদেবী

শ্রীমতী অঞ্জলি মণ্ডল হিন্দুর ঘরে ঘরে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে প্রতিদিন যাতে গীতা পূজিত ও পাঠ হয় তার পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল কুমার দাস বলেন— গীতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে দেশবাসীকে। হিন্দুরা যদি

এই সময়

মন্দিরের দ্বার

ভক্ত এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। দ্বার

উন্মোচন সমারোহে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি হরিদ্বারের পতঞ্জলি যোগপীঠে পতঞ্জলি রিসার্চ সেন্টারের উদ্বোধনও করেন।

স্বয়ংক্রিয় হাওয়া অফিস

নাগপুরের দোঙ্গরগাঁওতে রাজ্যের প্রথম স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া অফিস চালু করল

মহারাষ্ট্র সরকার। প্রচলিত আবহাওয়া দপ্তরগুলি যে কাজ করে তার সবই করবে এই স্বয়ংক্রিয় দপ্তর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এর উদ্বোধন করেন।

বারান্দায় আশ্রয়

মুম্বইয়ের অরুন্ধতী মাত্রে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হলেও স্বভাবে পশুপ্রেমী।

পাখিপ্রেমী বা পতঙ্গপ্রেমীও বলা যায়। তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় চড়ুই টিয়া থেকে শুরু করে প্রজাপতি মথ সকলের স্থান। অরুন্ধতী তার পোষ্যদের শুধু খাবার বা জল নয়, বাসা বাঁধার সুযোগও করে দেন।

ধর্মপরায়ণ, নীতিপরায়ণ না হোন, তাহলে আমাদের স্বপ্নের ভারত গঠনের প্রয়াস সুদূর পরাহত হবে। এ কাজে মায়েদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক স্বপন মণ্ডল, ফাগু কর্মকার, সন্তোষ মণ্ডল, কার্তিক দেবনাথ, ভীম চন্দ্র মণ্ডল, ডুব্বু মণ্ডল, সুশীল কর্মকার, প্রকাশ রায় প্রমুখ।

বারাসাতে কুটুম্ব প্রবোধনের সভা

গত ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় বারাসাত জেলা কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ বিদ্যুৎ দত্তের গৃহে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় এক পারিবারিক সম্মেলন। অনুষ্ঠানে মা-বোন-সহ ৬০ জন

উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুত্ব ও হিন্দু পরিবার জীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ চন্দ্র নন্দী। হিন্দু সমাজের প্রগতির জন্য নিত্য সংস্কারের বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র।

শ্রদ্ধা'র ৮৭ তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৩ এপ্রিল সিউড়ী শহরের কল্পতরু পল্লী নিবাসী ৮২ বছর বয়স্কা শ্রীমত্যা পারুলরানি সোমকে 'শ্রদ্ধা'র ৮৭তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। ওঙ্কার ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী। শ্রদ্ধেয়া মাতাকে হস্তপদ ধুইয়ে ফুল, চন্দন, তুলসী দিয়ে পূজা করেন তাঁর বৌমা শ্রীমতী মন্দিরা সোম। মাল্যদান করেন একল বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তথা সমাজ সেবিকা শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তী। গীতা প্রদান করেন

শহরের বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক গোপীজনবল্লভ পদরেণু ঘোষ। এছাড়া মাতাকে পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল ও মিষ্টান্ন অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। মায়ের নাতি ও নাতনি শ্রীমান নির্মাল্য সোম ও মধুশ্রী সোম দু'খানি সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মায়ের সুযোগ্য পুত্র শিক্ষক, গায়ক ও গীতিকার বিমল সোম। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সুব্রত সিংহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

কাশ্মীরে অস্থিরতা দূর করতে বাহিনীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন

অতিথি কলম

অরুণ সাহানী

মে মাসের প্রথম দিনেই উচ্ছৃঙ্খল পাক বাহিনীর দুই ভারতীয় সৈনিককে হত্যার পর তাদের মৃতদেহ নিয়ে পৈশাচিক বর্বরতা প্রদর্শনের খবরে সারাদেশে একইসঙ্গে তীব্র হতাশা ও প্রতিশোধপরায়ণতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এই ক্ষোভ খুবই ন্যায়সঙ্গত। দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ঘটনার যথাযোগ্য প্রতিস্পর্ধী প্রতিক্রিয়া নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছে। একজন প্রাক্তন সৈনিক হিসেবে আমি নিশ্চিত আমাদের দেশের স্বার্থকে নিরাপদ রাখতে সেই প্রত্যাঘাত জাতীয় সম্মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিকল্পিত হবে। তবে একটা প্রশ্ন আসে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সেনা ও তথাকথিত নির্বাচিত সরকারের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলেই কি আমাদের সীমান্তে এমন অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে? কিন্তু তবুও এই প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো এই সমস্ত আধা সামরিক ও সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ জম্মু কাশ্মীরের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের মদতে চলা দেশবিরোধী প্রক্সি ওয়ার-কে যথেষ্ট অক্সিজেন যে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে এই নৃশংস ঘটনার আগেই নানান সোশ্যাল মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলগুলিতে সি আর পি এফ জওয়ানদের ওপর কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকেরা কী ধরনের অত্যাচার চালাচ্ছে তার ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এই ভিডিও চিত্রগুলিতে কেবলমাত্র দেশের উর্দিধারী সেবকদেরই নিগৃহীত করা হয়নি দেশের গরিষ্ঠাংশের নাগরিকদের মনেও আঘাত লেগেছে। বিশেষ করে আন্দোলনকারীদের শরীরি ভাষা ও দেশের সরকারকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করার বিকৃত মানসিকতার ছবিটি গভীর চিন্তার বিষয়— এই ব্যবহারিক বিকার একান্ত নতুন ও অত্যন্ত অশুভ সঙ্কেত।

কেন্দ্রীয় স্তরে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের ঘটনা পরম্পরা বরাবরের মতোই প্রত্যাশিত। বিবৃতির মাধ্যমে ক্ষোভ, হতাশা, আক্রোশ সবই ব্যক্ত হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলি টিআরপি বাড়ানোর জন্য হুড়োহুড়ি করেছে। অজস্র বিতর্কসভার কেন্দ্রবিন্দু ছিল চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ঔচিত্য আর অসারতা নিয়ে। যার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল নিষ্ফলা। উপত্যকার পরিস্থিতি কেন এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল আর সেই অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমণের নিদানই বা কী আজ সেই উত্তরগুলিই খোঁজা ভীষণ দরকার।

পিঠোপিঠি ঘটে যাওয়া দু'টো ঘটনাই উপত্যকায় পরিস্থিতির জটিলতার চিত্রটাই তুলে ধরে। আপাতভাবে দু'টি ঘটনা ভিন্ন মনে হলেও জন্মসূত্রে তারা কিন্তু একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উপত্যকায় অস্থিরতার সৃষ্টিতে দু'টিরই সমান ভূমিকা। তাই রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একই সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সীমান্তে পাকিস্তানের অন্যায় মস্তানি থামাতে ও বৈদেশিক নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রটি সুদৃঢ় করতে হলে একটি সুচিন্তিত জাতীয় নীতি প্রয়োজন। কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরের অস্থিরতা দমনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পরিস্থিতি যে এতটা খারাপ হয়েছে তার মূল কারণ দুটি। প্রথম, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাকে খর্ব করে দেওয়া বা তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া। দ্বিতীয় মোক্ষম কারণটি হলো রাজনৈতিক দলগুলির একে অপরকে দোষারোপ করে নিজে বড় হওয়ার অভিসন্ধি।

সন্ত্রাসবাদীদের যদি এটা জানা থাকে যে উর্দিধারী সেনাবাহিনীর নিজের হাতে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার উপযুক্ত ক্ষমতা নেই তাহলে তারা তো সাপের পাঁচ পা দেখবেই। কেন তারা আলোচনার শান্তিপথে আসবে? তাই কোনো আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলে তারা জানে যে আলোচনা এড়িয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে গেলেও বাহিনী কিছু করতে পারবে না। ঠিক এটাই এখন উপত্যকায় ঘটে চলেছে।

সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে কাউন্টার টেররিজম চালানো দরকার। তা করতে হবে— 'an iron fist in a velvet gloves' —নরম ভেলভেটের দস্তানার মধ্যে থাকবে শিবাজীর বাঘনখ। সামরিক তৎপরতা বাড়ানোর মাধ্যমে কট্টর জঙ্গি নেতাদের এক এক করে নিকেষ করতে হবে। তা হলে চাপটা বুঝতে পেরে বেআইনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হবে। সন্ত্রাসবাদীদের যদি এটা জানা থাকে যে উর্দিধারী সেনাবাহিনীর নিজের হাতে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার উপযুক্ত ক্ষমতা নেই তাহলে তারা তো সাপের পাঁচ পা দেখবেই। কেন তারা আলোচনার শান্তি পথে আসবে? তাই কোনো আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলে তারা জানে যে আলোচনা এড়িয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে গেলেও বাহিনী কিছু বলতে পারবে না। ঠিক এটাই এখন উপত্যকায় ঘটে চলেছে। আজকের কাশ্মীরে কোনো ঘটনা ঘটে গেলেই ঠারেঠোরে জনতাকে খুশি রাখতে নির্ভীক জীবন বাজি রাখা নিরাপত্তা বাহিনীর ঘাড়েই চুপচাপ দোষটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরই পরিণতিতে প্রায়শই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে নাগরিকদের সংঘর্ষ ঘটছে। নাগরিকদের মানসিকতায় বাহিনীর ওপর একটা ঘৃণার আস্তরণ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রায়শই বাহিনীকে লক্ষ্য করে অবিরাম পাথর ছোঁড়ার প্রত্যুত্তরে পেলেট গানের ব্যবহারে নাগরিকরাও আহত হচ্ছেন। জেহাদিদের শবযাত্রায় বিপুল জনতার ভিড় হচ্ছে। কবরস্থানে গিয়ে মৌলবাদী ধর্মীয় নেতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়তের মাতব্বররা উত্তেজক ভাষণ দিয়ে জনতাকে খেপিয়ে তুলছে। জনসমক্ষে নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর রাজনৈতিক প্ররোচনায় তাদের উচ্চতর অফিসারদের ধমকানি ও রাজনীতিবিদদের খোলাখুলি তাদের নিছক কর্তব্য পালনের প্রতিবাদে ভর্ৎসনা ও অন্যায় দোষারোপ করায় বাহিনীর মনোবল ভেঙে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একই সঙ্গে তাদের নিজস্ব সম্ভ্রম আজ ধ্বংসের পথে। তাই এখুনি নিরাপত্তাবাহিনীর যথাযোগ্য সামাজিক তথা পদমর্যাদার পুনরুজ্জীবন ঘটানো দরকার। সরকার ও নাগরিকদের একত্রে দেশের সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় বাহিনীর মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

শ্রীনগরে জেহাদি শক্তির বাড় বৃদ্ধি ও মদত পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিডিপি-র কিছু নেতার দেশবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশপ্রণোদিত বক্তব্যগুলি ভয়ঙ্কর ভাবে দায়ী। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে মিরওয়াজ উমর ফারাকির মতো তথাকথিত সম্মাননীয় নেতাদের নানান তাৎক্ষণিক প্ররোচনামূলক ভাষণ।

আজাদির পক্ষে সওয়াল করা, বিভিন্ন সংঘর্ষপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলি থেকে এই তকমা তুলে দেওয়া, উপত্যকা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া এই ধরনের আওয়াজ তুললে জনতাকে সহজে খেপিয়ে তোলা যায় এবং এর ফলে এই সব দেশবিরোধী নেতাদের সমর্থন বাড়ে ও তাদের নেতৃত্ব কায়েম থাকে।

এক্ষেত্রে টিভি সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করব তারা যেন সংবেদনশীল ঘটনাগুলিকে একটু ভেবে চিন্তে জনতার জন্য পরিবেশন করেন। দেখুন বৃহত্তর জনমানসে ভ্রান্ত ধারণার যেন সৃষ্টি না হয়। চমকে দেওয়া দৃশ্যগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করুন। দেশবিরোধী শক্তি যদি প্রচারের আলো না পায় তাহলে তাদের ঘৃণার গাছ সহজে বাড়তে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নিতে গেলেই সব রকমের রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা মতৈক্যে পৌঁছনো জরুরি। জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক নেতারা যেন একই সুরে কথা বলেন। এ কাজটা করতে পারলে উপত্যকায় নির্বাচিত সরকারের আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার আম নাগরিকরাও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিশা পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, সরকারের নীতি কার্যকরী করার বিভিন্ন সংস্থারও হাত শক্ত হতে পারে। এ ছাড়া স্থানীয় নেতৃত্বকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে গ্রামের নেতৃস্থানীয় বা শহরের সামাজিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করে বোঝানো দরকার যাতে তাদের পরিবারের তরুণ সদস্যরা মিথ্যে জেহাদি প্রচারে প্রভাবিত না হয়।

সর্বশেষ কাজ হিসেবে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে সামাজিক স্তরে যেমন সব ধরনের লোকের মত গোপনে সংগ্রহ করতে হবে ঠিক তেমনি ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ দেশবিরোধী শক্তিগুলির মধ্যেও আত্মগোপন করে ঢুকে পড়তে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এর ফলে তারা আগে ভাগেই সন্ত্রাসীদের সম্ভাব্য কুকীর্তিগুলির কিছু খবর পেয়ে যাবে। একই সঙ্গে ওই দেশবিরোধী সংগঠনগুলির যুবকদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে তাঁরা গোপনীয়তা বজায় রেখে বড়সড় পরিবর্তন আনারও সুযোগ পেতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিককালে উগ্রবাদীদের থেকে ইখোয়ানি গোষ্ঠীর ভেঙে বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনীর সাহায্যে কাজ করার কথা উল্লেখ করা জরুরি। এরা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান থেকে আসা বিদেশি জঙ্গিদের নিকেষ করেছে। এদের সকলকেই পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীতে শামিল করে নেওয়া হয়েছে। উপত্যকায় এই ধরনের গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে জেহাদিদের ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সাফল্য লাভের নিত্য পরিবর্তনশীলতার থিয়োরি মাথায় রেখে নতুন পদ্ধতি বের করে প্রোঅ্যাক্টিভ প্রক্রিয়ায় কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ, সাউথ ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড)

চিঠিপত্র

বিশ্ব বাংলা

ইদানীং ‘বিশ্ব বাংলা’ নামে কিছু প্রতীক চিহ্ন রাজপথের ধারে ও সরকারি যানবাহনের গায়ে খুব দৃশ্যমান হচ্ছে। যতদূর জানি কিছু শিল্পদ্যোগ এই নামে সরকারি বদান্যতায় চলছে। এই নামে বিশ্বভারতীর অদূরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও হচ্ছে। তা চলুক, কিন্তু ‘বিশ্ব-বাংলা’ নামকরণের তাৎপর্য কী? আরও প্রশ্ন জাগে এই প্রতীক চিহ্নে সবুজ রংয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের পশ্চাদপটে বিশ্বের মানচিত্র (সবুজ রঙে রঞ্জিত) দেখানোর উদ্দেশ্য কী? এ কি ইসলামিকরণের পূর্বাভাস?

উদ্দেশ্য যদি হয় পশ্চিমবঙ্গের গৌরবকে তুলে ধরা, তাহলে তা ভারতের মানচিত্রের পশ্চাদ্‌পটে তুলে ধরা উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পিছনে বিশ্বের মানচিত্র কেন? পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র, বিশ্বের মাঝে কোনো একটি দেশ তো নয় এটা। আর মানচিত্র যখন পশ্চিমবাংলার, তখন এখানে বিশ্ব-বাংলা নাম কেন? যদি বাংলাদেশ এটা করত, তাহলে তা যুক্তিযুক্ত হোত। কারণ অধুনা বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে আলাদা একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃত। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের নাম পাল্টে ‘বাংলা’ করা নিয়ে খুব হৈচৈ করা হয়েছিল। স্বস্তিকায় এ সম্পর্কে কিছু লেখাও বেরিয়েছিল। কারণ এভাবে দেশভাগের বিষময় স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার, ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রকট হচ্ছিল।

তাই এ ধরনের কার্যকলাপে উগ্র প্রাদেশিকতার ছায়া দেখা যেতে পারে। আর এই প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা যাতে জাতিকে দুর্বল না করে দেয় তার জন্য ১৯৬১ সালে জাতীয় সংহতি মঞ্চ (National Integration Council) গঠিত হয়েছিল। যাতে ভারতের নাগরিকরা নিজেদের ভারতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করে— নিজেদের বাঙালি, পঞ্জাবি, অসমিয়, দক্ষিণ-ভারতীয় ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ পরিচিতির ঊর্ধ্বে ওঠে। অথচ স্বাধীনতার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা সেই সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছি না।

অথচ দেখুন বাঙালি কবি গেয়েছেন ‘বল বল বল সবে শত বীণা বেণুরবে, ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’, বা কেউ গেছেছেন ‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’ ইত্যাদি। বিশ্বের দরবারে তাঁরা ভারতকেই বড় দেখতে চেয়েছেন— কোনো প্রদেশকে নয়।

—**প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,**
পাটুলি, কলকাতা।

মমতার উদ্বেগ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকায় বসবাসকারীদের উপর বর্ণবৈষম্যবাদী ও চরমপন্থী আমেরিকার ভূমিপুত্রদের আক্রমণ এবং হতাহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কাছে চিঠি লিখে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

মানছি, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, আক্রমণ নেমে এলে প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। মমতারও তাই হয়েছে। কিন্তু তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূলনেত্রী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসন প্রদান করা তো তাঁরই দায়িত্ব। এ রাজ্যবাসীর সুখ-শান্তি বজায় রাখাও তাঁর কাজ। কিন্তু সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন? সত্যি বলতে, পশ্চিমবঙ্গে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। দুষ্কৃতীদের অভয়ারণ্য আজ এরাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতার সেদিকে নজর নেই। তাঁর নজর আমেরিকায় আক্রান্ত, আহত, নিহত ভারতীয়দের দিকে। যত উদ্বেগ তাদের জন্য। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে তো প্রতিনিয়ত হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত, আহত নিহত হচ্ছে। কই, তার প্রতিবাদ করতে, তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হতে বা তাদের দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে তো তাকে দেখি না! দেখব কী করে, দেখলে যে এরাজ্যের মুসলমান ভাইয়েরা রাগ করবে। তৃণমূলকে ভোট হারাতে হবে। আর আমেরিকায় আক্রান্ত, আহত, নিহত ভারতীয়দের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলে এরাজ্যে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভণ্ডামির রাজনীতি আর কাকে বলে?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ফুটপাথ দখলমুক্ত হোক

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিপরীতে যোগাযোগ ভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারের সন্নিহিত ফুটপাথ পুরোপুরি ভবঘুরেদের দখলে চলে গেছে। এরা ফুটপাথ জুড়ে তাঁবু টাঙিয়ে বাস করছে, উনুন জ্বেলে রান্না করছে এবং রেলিংয়ে কাপড় শুকাচ্ছে। সাধারণ পথচারী যাদের ফুটপাথ ব্যবহার করার কথা, তারা বাধ্য হচ্ছেন ফুটপাথ ছেড়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে। এমনকী যাত্রী প্রতীক্ষালয়টিও দখল হয়ে গিয়েছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের দুই দিকে (অর্থাৎ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত) যানবাহন খুব দ্রুতগতিতে চলাচল করে। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। দ্রুতগতির যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীকে ধাক্কা মারতে পারে। শহরের ব্যস্ততম একটি ফুটপাথ, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অবস্থিত, দখল হয়ে গেল, অথচ পুলিশ, প্রশাসন, পুরসভা নির্বিকার। নাগরিকদের প্রতি কী এদের কোনো দায়িত্ব নেই? চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে যোগাযোগ ভবন সংলগ্ন ফুটপাথ অবিলম্বে দখলমুক্ত করে পথচারীদের ফিরিয়ে দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—**সপ্তর্ষি ঘোষ,**
৫৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

সারদা/সরস্বতী শিশু মন্দিরের উপর রাজ্য সরকারের রক্তচক্ষু

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনো মানবশরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন মাথা সেরকম রাষ্ট্রদেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্র। মানবশরীরের হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ আহত হলেও যেমন মানবশরীরের প্রাণবিয়োগ হয় না কিন্তু মাথায় আঘাত হলে প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হয়। সেরকমই রাষ্ট্রকাঠামোর বিভিন্ন অংশ যেমন--- রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্র আঘাতপ্রাপ্ত হলে রাষ্ট্রের সাময়িক হানি হলেও রাষ্ট্রের সামগ্রিক পতন সাধিত হয় না কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্র আঘাতপ্রাপ্ত হলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। এর নজির মানবসভ্যতার ইতিহাসে আছে প্রচুর। মুসলমান আক্রমণে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন এবং বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অবসানে মিশর সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তি তারই নিদর্শন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, ধ্বংসের এই নিদর্শন দেখার জন্য এখন আর ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে না, বর্তমান পশ্চিমবাংলায় চোখ রাখলেই এই ধ্বংস কর্মের নিদর্শন লক্ষ্য করা যাবে।

পশ্চিমবাংলার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গত তিন দশক ধরে রাজনৈতিক আঘাত এসেছে ক্রমান্বয়ে, এখন মড়ার ওপর খাড়ার ঘা দিতে উদ্যত হয়েছে বর্তমান শাসককুল। বর্তমানে তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শের অনুপ্রেরণায় বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দিতে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এর ফলে কীভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং কাজটি কী কী কারণে অনুচিত বিশ্লেষণে দেখা যাক।

প্রথমত, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। সেই অন্তস্থিত শক্তির বিকাশ ঘটাতে প্রয়োজন পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যার সাধনায় ছাত্রদের শিশুকাল থেকেই অভ্যস্ত করে তোলা। কিন্তু একথা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য যে বিদ্যাচর্চার একদা পীঠস্থান বাংলায় আজ পরা অপরা উভয় প্রকার বিদ্যার সাধনাই লুপ্তপ্রায়। পরাবিদ্যার যে দুটি ধারা বর্তমান তার প্রথমটি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা জীবনদর্শন সংক্রান্ত শিক্ষা বহুদিন হলো রাজ্য থেকে উধাও। কারণ রাজ্যের বিগত ও বর্তমান শাসককুল তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভূত দেখে আর দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ দেশাত্মবোধ সংক্রান্ত শিক্ষাও নেহরুবাদী চিন্তার ধারক ও বাহক বর্তমান শাসককুল ও চিরকালের বিদেশমুখী বিগত শাসককুলের দ্বারা বর্জিত। এছাড়া পাইয়ে দেওয়ার, টোকাটুকির সুযোগ করে পাশ করিয়ে দেওয়ার রাজ্যে অপরা বিদ্যাও অনুশীলনের অভাবে লুপ্তপ্রায়। অর্থাৎ শিক্ষার অভাবে এ রাজ্যের ছাত্রসমাজ অন্ধকারে নিমজ্জমান। এ অবস্থায় পরা অপরা উভয়প্রকার বিদ্যার সাধনার মাধ্যমে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত রেখে এ রাজ্যের ছাত্রসমাজকে পথনির্দেশ করছে একমাত্র শিশুমন্দিরগুলি। সেই শিশুমন্দিরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এ রাজ্যের ছাত্রসমাজের চরম ক্ষতি করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

দ্বিতীয়ত, যে কারণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার শিশুমন্দিরগুলিকে নিষিদ্ধ করতে চলেছে সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প শিশুমনে প্রবেশ করানোর অপরাধে সবচেয়ে বেশি অপরাধী রাজ্যসরকারি স্কুলগুলিই। দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে 'ইসলামের স্বরূপ' অন্তর্ভুক্ত করা থেকে শুরু করে বহু আলোচিত বাংলা শব্দের রূপান্তর ঘটানো, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প শিশুমনে প্রবেশ করানোয় রাজ্য সরকার ক্লান্তিহীন। সেই সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রাজ্যের ছাত্রসমাজকে মুক্ত রেখেছে শিশুমন্দিরের শিক্ষা। শিশুমন্দিরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে রাজ্যসরকার তাই রাজ্যের ছাত্রসমাজকেই করছে বিপন্ন।

মধ্যযুগীয় ভাবধারায় চালিত, চরম সাম্প্রদায়িক শিক্ষার পীঠস্থান এবং জেহাদি সন্ত্রাসবাদী তৈরির কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলিকে রাজ্যসরকার সবরকম সাহায্য করছে (অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবে), নতুন দশ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়ার পরিকল্পনা করছে আর অপরদিকে শিশুমন্দিরগুলিকে বন্ধ করার কথা ভাবছে। অর্থাৎ একদিকে রোগের জীবাণুকে শরীরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, অপরদিকে রোগনাশক ওষুধকে শরীর থেকে দূর করার ব্যবস্থা করছে। এ কাজে রাজ্যসরকারের প্রধান সঙ্গী হলো রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। রাজ্যের উন্নতির ব্যাপারে একমত হতে না পারলেও রাজ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকর এই ব্যাপারে শাসক-বিরোধী একমত।

জনগণকে রক্ষা করাই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ক্ষতির ব্যাপারে সংগঠিত। ঈশ্বরের কাছে তাই এ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের একটাই প্রার্থনা— এই রাজ্য যেন অবিলম্বে এই উভয় প্রকার জনপ্রতিনিধিদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, প্রকৃত জনগণের শুভচিন্তক জনপ্রতিনিধিদের হাতে পড়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। ■

পরম্পরা

ভারতের নাথ সম্প্রদায়

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রথম ব্রহ্মচারী জীবনে দীক্ষা গ্রহণের কথা চিন্তা করেন নাই। জন্মগত আধ্যাত্মিক শক্তির উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালে তাঁর এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বলেন, 'ভালো লাগছে না মাস্টারমশাই। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী হব— না হলে কিছু করা যাবে না...।' একথা শুনে ২৩ বছর বয়সী প্রধান শিক্ষক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন তাঁর এই বিশেষ ছাত্রটি হয়তো আবেগের ভরে এসব বলছে। যাতে সে ভুল পথে না যায় তার জন্য উপদেশ দিলেন, 'যদি যাবি তো যা একজনের কাছে, যার কাছে আমি মাথা বিকিয়েছি। তিনি তোকে প্রতারিত করবেন না, ঠিক পথ বলে দেবেন।' মাস্টারমশাইয়ের এই কথা ব্রহ্মচারীর মনে দাগ কাটায় কিছুকাল পরে তিনি সন্ন্যাস নেবার সংকল্প গ্রহণ করে গোরক্ষপুর গিয়ে নাথ সম্প্রদায়ের মহাযোগী স্বামী গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেকালের বাংলায় দীক্ষা দেওয়ার জন্য আরও অনেক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তা সব ছেড়ে কোন আকর্ষণে তিনি গম্ভীরনাথজীর শরণাপন্ন হলেন, তার কারণ উন্মোচনের সাগ্রহ চেষ্টার ফলশ্রুতি এই প্রবন্ধ।

শ্রীশ্রী যুগাচার্য-জীবনচরিত—স্বামী বেদানন্দ।

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

নাথ সম্প্রদায় বাংলা তথা ভারতের একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। সম্প্রদায়টি আকারে ছোট হলেও ভারতের অনেক স্থানেই তাদের অস্তিত্ব ছিল। যতদূর জানা যায়, নাথ সম্প্রদায় মূলত বাংলা তথা পূর্ব ভারতের। এটি উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা থেকে। বাংলাদেশে পাল রাজগণ ৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনো না কোনো অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তারপর সেনবংশ বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। মোটামুটি ১০৫৫ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন রাজগণ বাংলার শাসক ছিলেন। সেন রাজবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজি ১২০২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করে। বাংলায় শুরু হয় মুসলমান শাসন। লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরে পলায়ন করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর বংশধরেরা আরও বেশকিছুদিন রাজত্ব করেন। ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বৌদ্ধধর্ম বিদায় নেওয়ার পরেও বাংলায় আরও কয়েকশো বছর বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল।

১১৬২ খ্রিস্টাব্দেও বাংলার এক অংশে পাল বংশের শেষ রাজা মদন পাল রাজত্ব করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন বাংলায় সেন রাজাদের অভ্যুদয়ই এর কারণ। কিন্তু সেন রাজগণ একক ভাবে সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন খুবই অল্প সময়ের জন্য। তাঁদের আমলেও বাংলার বহু জায়গায় পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। তারপর সেন রাজারা বৌদ্ধধর্ম বিরোধী কোনো নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের এভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ হতে পারে দেশের শাসক পরিবর্তন। বৌদ্ধ পাল রাজাদের পরে হিন্দু সেনবংশ বাংলায় ক্ষমতা দখল করলে অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও খুব বেশি হবে না। কারণ হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়া যত সহজ, সেখানে প্রবেশের পথ তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম। লক্ষ্মণ সেনের পর বাংলায় মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয়। তখন বহু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কারণ পরবর্তীকালে দেখা গেছে বাংলার যেসব অঞ্চলে এক সময় বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, সেখানে কালক্রমে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইসলামের আগ্রাসী নীতির ফলে নিরীহ, অহিংসবাদী বৌদ্ধরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনসংখ্যার মধ্যে যারা হিন্দুধর্মে প্রবেশ করতে পারেনি এবং যারা ইসলামও গ্রহণ করেননি, তারা গেলেন কোথায়? সেই সময়কার বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মহাযানপন্থী— বজ্রযান ও মন্ত্রযান শাখাভুক্ত। 'এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকেই নাথ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং পূর্বোক্ত না হিন্দু না মুসলমান বৌদ্ধদের নিয়ে নাথ সম্প্রদায় গড়ে উঠলো বলে আমরা মনে করি।'

নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরু পরম্পরায় গভীরভাবে বিশ্বাসী। গুরুর প্রতি অচলাভক্তি নাথ সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য। নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন লুইপাদ বা মীননাথ। তিনি বাংলার শাসক রামপালের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনেকের মত। তিব্বতি সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তারানাথের মতে এই কৃষ্ণপাদের বাড়ি ছিল বিদ্যানগর। তিনি পাল রাজা দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল সোমপুরী বিহার। আবার তিব্বতি লেখক

সুম্পার মতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত একজন তান্ত্রিক আচার্য। ইনি ৫০ টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-পদ্ধতি সংক্রান্ত। এছাড়া চর্যাগীতি গ্রন্থে কৃষ্ণপাদের ১০ খানি গীতি আছে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় তাঁর রচিত একখানা দোঁহাকোষও প্রকাশিত হয়েছিল।

তিলপ, তিলোপা বা তেলিযোগী নামে আরেকজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগীর নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বাংলার পাল রাজা মহীপালের সমসাময়িক। তিব্বতি ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের একজন ব্রাহ্মণ। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং তার নতুন নাম হয় 'প্রজ্ঞাবর্মা' বা 'প্রজ্ঞাভদ্র'। তিনি চারখানি বজ্রযানী গ্রন্থ, একখানি দোহাকোষ ও একখানা সহজ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এই তিলোপার একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন নারোপা বা নাড়োপা। তিনিও একজন সিদ্ধাচার্য। তাঁর উপাধি ছিল 'জ্ঞানসিদ্ধি' ও 'যশোভদ্র'। তাঁর বাসস্থান ছিল মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরি নামক জায়গায়। তিনি আবার তন্ত্রশাস্ত্র চর্চা করতেন। তিব্বতি ঐতিহ্য মতে তার দু'টি পরিচয় পাওয়া যায়। একমতে তিনি ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুভশান্তি বর্মার পুত্র। অন্যমতে তিনি ছিলেন কোনো এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের পুত্র। পরে হন এক তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত। ইনি সবশেষে 'যশোধর' বা 'জ্ঞানসিদ্ধি' নাম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। তেঙ্গুর নামক বিখ্যাত তিব্বতি গ্রন্থে তাঁকে মহাচার্য, মহাযোগী ও শ্রী মহামুদ্রাচার্য নামে ভূষিত করা হয়েছে। আচার্য জেতারির পরে তিনি বিক্রমশীল বিহারের উত্তরদ্বারী পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অবসর গ্রহণ কালে তিনি আচার্য অতীশ দীপঙ্করের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তিনি বজ্রযানী দেব-দেবীর উপর প্রায় দশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'কালচক্রযানী দীক্ষা' সম্বন্ধে একখানা ও দু'খানা বজ্রগীতি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

বাংলায় সিদ্ধাচার্যদের তালিকা সুদীর্ঘ। ''ব্রহ্মযোগী নামক পুথিতে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এই ৮৪ জনের মধ্যে একজন অন্যতম প্রধান সিদ্ধা ছিলেন চৌরঙ্গীনাথ। তিনি শালিবন নগরে যাতায়াত করতেন। 'ময়নামতীর গান' ও গোরক্ষ বিজয় নামক পুঁথিতে যে প্রসিদ্ধ নাথ যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।''

''শালবন রাজার পুত্র গাভুর সিদ্ধাই ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ের অধিবাসী ছিলেন। কুমিল্লা হইতে চার মাইল দুরে পশ্চিমে শালবনপুর গ্রাম এবং তথায় শালবনের দীঘি এখনও বিদ্যমান। ওই গ্রামে শালবনের প্রাচীর বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই বাসভবন শালবন ও হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ি বলিয়া জনশ্রুতি আছে। নাথ যোগী চৌরঙ্গি এই শালবানপুরে বাস করতেন।''

বিখ্যাত তিব্বতি গ্রন্থ তেঙ্গুর, মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের বিভিন্ন পুস্তক, প্রাচীন চর্যাপদ, সংস্কৃত গ্রন্থ, দোঁহা ও পুঁথি থেকে যা জানা যায়, তাতে মনে হয় নাথ সম্প্রদায় ও নাথ ধর্ম প্রায় হাজার বছরের পুরনো। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন, গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর গুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ হয়তো আরও ৫০/৬০ বছর পূর্ববর্তী হবেন। কারও কারও মতে, মৎস্যেন্দ্রনাথ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত রাজের সনির্বন্ধ অনুরোধে ৬০ বছর বয়সে তিব্বত গমন করেন ও ১৩ বছর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে ৭৩ বছর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতেই দেহরক্ষা করেন। তিব্বতে বাসকালে তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা করেন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে। তেঙ্গুর তালিকায় এই বইগুলির নাম পাওয়া যায়। তাঁর সময় থেকেই তিব্বতের সঙ্গে বাংলার একটি নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে তিব্বতি গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বহু তথ্য তিব্বতি ভাষায় রচিত হয়। তেঙ্গুর নামক তিব্বতি গ্রন্থ থেকে এসব জানা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও নাথ 'যোগী ও নাথ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাথ সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ''মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে 'বৌদ্ধচর্যাপদ' বা 'বৌদ্ধ চর্যাগীতি'র যে সংকলন আবিষ্কার করিয়া 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামে প্রকাশিত করেন তাহাই বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।''

এই 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'-এর অনেক চর্যাপদ ও দোঁহা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, লুইপা, কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নোপা রচিত। এরপর বাংলায় বহু কবি ও সাধক, হিন্দু ও মুসলমান লেখক নাথ সম্প্রদায় ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালী ও সিদ্ধাচার্যদের নিয়ে বহু পুঁথি বাংলায় রচনা করেছেন। 'গোরক্ষবিজয়' ও 'ময়নামতীর গান' বা আখ্যান প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মূলত নাথ সম্প্রদায় সম্পর্কিত হলেও এসব পুঁথি সেকালে বাংলায় বহুল প্রচারিত হয়েছিল।

প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এই নাথ সম্প্রদায়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নেতা ছিলেন গোরক্ষপুরের যোগীরাজ গম্ভীরনাথজী। তাই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কথায় ঐশী নির্দেশে আচার্য প্রণবানন্দ গোরক্ষপুর ছুটে গিয়েছিলেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই নাথ সম্প্রদায়ের বর্তমান মোহান্ত।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলার নাথ সাহিত্য— সুখময় মুখোপাধ্যায়। ২। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)— ড. নীহার রঞ্জন রায়। ৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)— ড. নীহার রঞ্জন রায়। ৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)— ড. নীহার রঞ্জন রায়। ৫। বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড)— দীনেশ চন্দ্র সেন। ৬। ইতিহাস ও আলোচনা— অধ্যাপক শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্ধৃতি বৃহৎ বঙ্গ। ৭। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)— ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

(লেখক একজন জাতীয় শিক্ষক)

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

জোহান উলফ্‌গ্যাং ভন গ্যেটে :
(১৭৪৯-১৮৩২)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, কবি ও দার্শনিক। তাঁর লেখা পরবর্তীকালে বহু প্রথিতযশা ব্যক্তির যেমন, ইকবাল, লামার্ক, ডারউইন, হেগেল, কারলাইল, শোপেনহাওয়ার, নিৎশে এবং নিকোলা টেস্‌লাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।
উদ্ধৃতি : যখন আমি প্রথমে হিন্দুদের অক্ষয় কীর্তি 'শকুন্তলা' হাতে পাই, আমার মধ্যে এমনই উৎসাহের প্লাবন বয়ে যেতে লাগল যে, আমি শেষ না করে আর থাকতে পারলাম না। আমি এক অদম্য আবেগের তাড়নায় একে জার্মানির নাট্যমঞ্চে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। আমার সে সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল বটে কিন্তু আমি এর সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছিলাম যে আমার সমস্ত জীবনটাই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছিল। আমি এতে এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, গত ৩০ বৎসর আমি আর জার্মান বা ইংরেজি নাটকের ধারে কাছেও ঘেঁষিনি।
উৎস : লেটার্‌স ফ্রম গ্যেটে—জোহান উলফ্‌গ্যাং ভন গ্যেটে।
উদ্ধৃতি : এখন আমি বুঝতে পারি আমার প্রথম জীবনের 'শকুন্তলা' আমার মনে কতই না গভীর এবং ব্যাপক ছাপ ফেলতে পেরেছিল।
'তুমি আমার যৌবনের কুসুমিত দিনগুলি এবং তার শুষ্ক ফলগুলি!
ও, শকুন্তলা, তুমি কি মর্ত্য অথবা স্বর্গের সমন্বয়ে গঠিত এক অসামান্যা মুগ্ধকারী, আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত মানবী না দেবী? আমি তোমাকে এক নামে চিনেছি তা হলো 'শকুন্তলা'।
উৎস : দ্য ওয়াননেস/আদারনেস মিস্ট্রি...সুতাপস ভট্টাচার্য।
বি.দ্র. : সারা বিশ্বের প্রথম নাট্যকার মহাকবি কালিদাসের অমরকীর্তি 'শকুন্তলা' প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন এবং তারপর জর্জ ফরস্টার তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

জঁ সিলভা বেইলি :
(১৭৩৬-১৭৯৩)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথের সঠিক গণনা করে।
উদ্ধৃতি : হিন্দুদের জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে সব থেকে প্রাচীন। আর তার থেকেই ইজিপসিয়ান, গ্রিক, রোমান এমনকি ইহুদিরাও তাদের জ্ঞান আহরণ করেছিল।
উৎস : দ্য সিক্রেট ডক্‌ট্রিন, ভল্যুম ৩—হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাট্‌স্কি।
উদ্ধৃতি : হিন্দুরা আজ থেকে ৪৫০০ বছর পূর্বেই নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থানের পরিবর্তন নির্ণয় করতে পেরেছিল যা আধুনিক যুগের অর্থাৎ ক্যাসিলি এবং মেয়ারের সারণীর থেকে এক মিনিটেরও বেশি বা কম হয়নি।
উৎস : ওয়ার্ল্ড অ্যাজ্ সিন আন্ডার দ্য লেন্স অব এ সাইনটিস্ট— ড. বিথাল. বি.শেট্টি।

জ্যাক সরফাট্টি : (১৯৩৯-)
পরিচিতি : ইনি আমেরিকার অন্যতম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। তিনি কোয়ান্টাম ফিজিক্স, মহাবিশ্বতত্ত্ব ও পরমসত্তার উপলব্ধি বিষয়ে অনেক জনপ্রিয় পুস্তকের রচনা করেন।
উদ্ধৃতি : আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম ফিজিক্স—ভবিষ্যতে এই দু'টি কোনো এক গভীরতত্ত্ব অর্থাৎ এক মহাজাগতিক পরম উপলব্ধির পরিপূরক মতবাদ হবে। এই মহাজাগতিক পরম উপলব্ধি অর্থাৎ ভারতীয় সাংখ্যদর্শনই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের কেন্দ্রভূমি হবে।
উৎস : মিস্টিসিজ্‌ম অ্যান্ড দ্য নিউ ফিজিক্স—মাইকেল ট্যালবট্।

অ্যালফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড :
(১৮৬১-১৯৪৭)
পরিচিতি : ইনি ছিলেন ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ। তিনি বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর গাণিতিক পদ্ধতিতে দর্শনশাস্ত্রের বিশ্লেষণের জন্য। তিনি বারট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে যৌথভাবে বিখ্যাত পুস্তক 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকার' সম্পাদনা করেন।
উদ্ধৃতি : বেদান্ত হচ্ছে মানব মনের সবথেকে হৃদয়গ্রাহী অধিবিদ্যা।
উৎস : ট্রিপ্টামাইন প্যালেস—৫-এম.ই.ও-ডি.এম.টি. অ্যান্ড দ্য সোনোরান ডেসার্ট টোড—জেম্‌স ওরক্।
(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

সংশোধনী

গত ১ মে ২০১৭, তারিখে স্বস্তিকায় পরম্পরা বিভাগে সাধন কুমার পালের 'আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদ এবং সংবাদমাধ্যম' প্রবন্ধে (১) প্রথম কলামে ১৩ নং পংক্তিতে 'সংবাদপত্রে' (২) ২৩নং পংক্তিতে 'প্রতিফলন' এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলামে ২৩ নং পংক্তিতে '১৮২৬' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক।

প্রতিদিনের সিরিয়ালেও চলছে নারী নির্যাতন

মধুমিতা দে

মেয়েদের ওপর নির্যাতন নতুন কোনো ঘটনা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের ঘর' থেকে রাজধানী শহর কলকাতার রাজপথ, সর্বত্রই প্রতিদিনের একটা সাধারণ ঘটনা হলো, মেয়েদের ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন। কেউ প্রকাশ্য রাস্তায় এই ঘটনা ঘটাচ্ছেন, আবার কেউ বন্ধ দরজার আড়ালে কাজটা সেরে ফেলেছেন। তফাতটা এই যা!

বাস্তবে যখন এই ঘটনা রোজই ঘটছে, সেখানে সেলুলয়েডও কিন্তু এই কাজে নিজেদের পাল্লা সমানভাবে ভারী করে চলেছে। প্রতিদিনের সিরিয়ালে তো শাশুড়িরা বাড়ির বউদের কীভাবে জব্দ করবেন, কীভাবে ছেলের পছন্দ করা বউকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছেলের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবেন, বৌদি কীভাবে দেওরের পাশে নিজের বোনকে আনার জন্য দেওরের প্রেম বানচাল করবেন— এই সব কিছুর ছক কষা চলছে। প্রতিদিন সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। সে দত্ত বাড়ির ছোট বউ-ই হোক বা দুই পৃথিবীর ইন্দিরা আর অভির সম্পর্ক— সবারই জীবন মোটামুটি একই ছকে বাঁধা। আর নিয়মমাফিক বাড়ির বউরাও বাড়ির এই খলনায়িকাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন শ্বশুরবাড়িতে নিজেদের অবস্থান পাকা করতে। ভাল কিছু করতে পারলে ক্ষণিকের জন্য কিছুটা বাহবা মিলছে, আবার চব্বিশ ঘণ্টা পার হলেই তা ভুলে গিয়ে আবার যে কে সেই ব্যাপার! এখন তো আবার ধারাবাহিকের আগাম বিজ্ঞাপনের ঝলকেও ব্যবহার করা হচ্ছে নানান চমক। 'রাশি কি পারবে শাশুড়ি-মন্ত্রী অপালা রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে উজ্জ্বলের কাছাকাছি আসতে?' 'ভালবাসা' পাওয়ার জন্য বিশ্বাসের দরকার হয়। শ্বশুরবাড়িতে প্রিয় হওয়ার জন্য স্বামীর পাশে থাকা খুব জরুরি। বিশ্বাস আর ভালবাসা না থাকলে সম্পর্ক থাকে না। সুধা, ভ্রমর, ইন্দিরা কি পারবে শ্বশুরবাড়িতে তাঁদের সম্মান ছিনিয়ে নিতে? দেখুন টান টান উত্তেজনায় তিন ধারাবাহিকের মহাসপ্তাহ।' ধারাবাহিকের এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মহাসপ্তাহ দেখার জন্য বাড়ির মেয়ে-বউদের হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে সব কাজ ছেড়ে বোকা বাক্সে চোখ রাখার জন্য। স্কুল-কলেজ থেকে চায়ের দোকান-রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই এখন ধারাবাহিকের নাম চেনা যাচ্ছে চরিত্রের নামে। 'ভবানী-তে এখন কী দেখাচ্ছে? ঈশানী কি রুদ্রপ্রসাদকে পুলিশের কাছে ধরাতে পারল?' ...আরও কত কিছু। সুতরাং সব ধারাবাহিকেই খলনায়ক পরীক্ষক এবং বলি হওয়া পরীক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে। দেখাও যাচ্ছে দু'পক্ষের মধ্যে একের পর এক টক্কর। অপালা রায় যতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাশিকে দমানোর চেষ্টা করুন না কেন, রাশি কিন্তু তার বুদ্ধির জোরে রায় ম্যানসনকে বিপদের হাত থেকে ঠিকই বাঁচিয়ে চলেছে। ওদিকে, ভবানী দিনের পর দিন ঊষসীকে মিথ্যেবাদী, চোর বলে হাজারো অপবাদ দেওয়া থেকে শুরু করে তার মা-বাবার শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, এমনকী তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া এবং বেশি পড়াশোনা জানার জন্য কথায় কথায় অপদস্থ করা সবটাই নিয়ম মেনে রোজ করে গিয়েছেন। কিন্তু এখন ভবানীর কথানুযায়ী এই বিদ্যেধরী বউ-ই নিশীথকে পাটায়া থেকে পৃথিবী বিখ্যাত রন্ধন প্রতিযোগিতায় জিতিয়ে এনেছে, এমনকী ভবানীর মেয়েকে সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য পড়ানোর দায়িত্বও নিয়েছে। কিন্তু এতেও ভবানী তার শাশুড়ির কর্তৃত্ব ফলানো থেকে একেবারেই সরে আসেনি। সুতরাং বাড়ির বউদের কদর যে একেবারেই আমাদের সমাজে এখনও খুব একটা স্থান পায় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নইলে কি আর শ্বশুরবাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের প্রথম চার-পাঁচ বছর যোগ্য হয়ে উঠতেই কেটে যায়? রাস্তাঘাটে পথচলতি লোকেদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, এখনকার ধারাবাহিকগুলোর প্রতিফলন সমাজ সংসারে পড়ছে। কিন্তু এতে ধারবাহিকের দায় কোথায়? অনেক ধারাবাহিক শুরুর আগেই তো বলা হয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই ধারবাহিকের গল্প তৈরি করা হয়, সেই অনুযায়ী চিত্রনাট্য লেখা হয়। শুধু ধারাবাহিক কেন, যে কোনো গল্পের বই, নিত্যদিনের ঘটনাও তো একই ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। তাই আগে থেকেই এই ধারা বইয়ের পাতায় ছিল। ইদানীংকালে, পর্দায় এসেছে বিপুলভাবে। কিন্তু ছিল না, তা নয়। তাই ধারবাহিক মানুষের মানসিকতার বদল ঘটনায়নি— এটা বলাই যায়। বর্তমানে বাড়ির বউদের এখন এটাই বাস্তব পরিস্থিতি। রাস্তার মেয়েদের ওপর অপরিচিত কোনো ব্যক্তির দ্বারা শারীরিক নির্যাতন প্রকাশ্য দিবালোকে হলে সহজেই সেগুলোকে কাঠগড়ায় তোলা যায়। তা নিয়ে মিটিং- মিছিলও হয়। আর পরিচিত ব্যক্তিরা যখন মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন চালায় তখন তা লিখিত বিয়ের লাইসেন্সের জোরে ছাড় পেয়ে যায়। এটাই হলো তফাত। বর্তমানে মেয়েদের বাস্তব জীবনকেই সেলুলয়েডে তুলে ধরা হচ্ছে। ধারাবাহিকের শেষে খলনায়িকার কী পরিণতি হচ্ছে তাও দেখানো হচ্ছে। সেই পরিণতি দেখে কি বাস্তবের খলনায়িকাদের নিজেদের বদলাতে ইচ্ছা করছে?

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

স্লিম থাকার পাঁচটি উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ঝরঝরে শরীর, বেশি চর্বি না, আবার চেহারা কমনীয়— এটাই হলো স্লিম থাকা। শুধু একটু হিসেব করে চলতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম তো আছেই। কিন্তু কী খাচ্ছেন সেটাও বড় ব্যাপার। আসুন দেখি নিজেকে কীভাবে সেই আকর্ষণীয় ফিগারে রাখতে পারি।

১। মোটামুটি পেট ভরে সকালের জলখাবার খান। এতে থাকবে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, সবজি ও ফলসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর উপাদান। দুধ-ডিম খুব ভাল। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েট কন্ট্রোল রেজিস্ট্রির হিসেব অনুযায়ী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ৩০ কেজি ওজন কমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এমন ১০ হাজার ব্যক্তির সবাই সকালে এ ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেয়ে থাকেন।

২। দুপুরে একটু কম খেলেও চলে। ভাত-ডাল-মাছ-মাংস তো থাকবেই। প্লেটের অর্ধেক থাকবে শাকসবজি। বিকেলের দিকে একটা আপেল বা পেয়ারা ধরনের দেশি ফল খেতে পারেন। এ সময় দারুণ খিদে পায় বলে তেলেভাজা খাবার খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়, যা আপনার ওজন বাড়িয়ে দেয়।

৩। আঁশসমৃদ্ধ খাদ্য বেশি খাবেন। ফলমূল-শাকসবজি, ঢেঁকিছাঁটা লাল চাল ও লাল আটায় (হোল গ্রেন) আঁশ বেশি থাকে। আঁশ পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে, ফলে খিদে কম পায়।

৪। বিপজ্জনক খাবার খাবেনই না। যেমন আইসক্রিম, চকোলেট, তেলেভাজা প্রভৃতি লোভনীয় খাবার। এসব যে একেবারে খাওয়া যাবে না, তা নয়। মাঝে মধ্যে চলে। কিন্তু বাড়িতে হাতের কাছে থাকলেই বিপদ।

৫। প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে ওজন নিন। পেট ও কোমরের মাপ নিয়ে দেখুন কমছে, না বাড়ছে। সে অনুযায়ী দরকার হলে পরের সপ্তাহে খাবার কমবেশি করুন। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মাপজোকের কাজটা সেরে ফেলুন। কারণ শনি-রবি ছুটির দিনে নিমন্ত্রণ থাকে, বিয়ে বা পার্টিতে একটু ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার থাকবেই। তা হলে পরের পাঁচটা দিনে সেই বাড়তিটুকু ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা যাবে। একটি ডায়েরিতে মাপগুলো লিখে রাখুন। ডায়েরি হারিয়ে ফেলবেন না। দু-তিন বছর পর চোখ বুলিয়ে দেখে নেবেন, কোথায় ছিলাম আর কোথায় যাচ্ছি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এটা ভাল উপায়।

একজিমায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

একজিমা একটি চর্মরোগ। এতে চুলকানি হয়, ত্বক ফুলে যায়। গোল গোল চাকা চাকা দেখতে হয়, বেশি বেড়ে গেলে সেখান থেকে রস গড়িয়ে গড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুখে, হাতে, কনুই, গলা, বুক, ঘাড়ে, হাতের বা পায়ের খাঁজে একজিমা হয়। একজিমা মূলত কয়েক রকমের হয়— কন্ট্যাক্ট ডার্মাই-টিস, ডিসাহাইড্রোটিক, নামমূলার একজিমা।

একজিমার কারণ :

প্রথমেই যে কারণটি তা হলো বংশগত কারণ। এছাড়া ত্বকের শুষ্কতাও একটি কারণ আর যে কারণটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এনভায়রনমেন্টল ফ্যাক্টর অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ। ফুলের রেণু, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্ট, বিশেষ কিছু খাবার যেমন ডিম, গোরুর দুধ, দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট, আঁশবিহীন মাছ, ইলিশ এবং চিংড়ি মাছে কারও কারও অ্যালার্জি জনিত কারণে একজিমা হতে পারে। নানান রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলেও এ রোগ হতে পারে।

বর্ষাকালে পায়ে ময়লা, দূষিত জল লাগলে একজিমা হতে পারে। কয়েকটি এ্যালোপাথিক ওষুধের প্রয়োগ হলেও একজিমা হতে পারে যেমন— পেনসিলিন, সালফার, টেট্রাসাইক্লিন, নরফ্লক্সাসন থেকে এই রোগ হতে পারে।

একজিমার লক্ষণ :

(১) লাল র‍্যাশের সঙ্গে চুলকানি।

(২) আক্রান্ত অংশ থেকে পুঁজ পড়া।

(৩) ত্বকের রঙ পালটে যাওয়া।

(৪) ক্রমাগত চুলকাতে চুলকাতে জায়গাটা মোটা হয়ে যায়। একে বলে লিবেনিফিকসান।

অন্য সময় র‍্যাশ বেরোনোর আগে চুলকানি শুরু হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয় করা হয় কীভাবে :

অ্যালার্জি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া টোটাল ব্লাড কাউন্ট, অনেক সময় দেখা যাবে ইওসিনোফিল বেড়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে কোনো রকম অ্যালার্জি বাহক। এছাড়াও ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেওয়া সিকন, বায়োপ্সি অ্যালার্জি স্কিন টেস্টিং করা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী সালফার, গ্রাফাইটস, সেরিনাম সিপিয়া, ফেগোপাইরাম, এ্যানথ কোকালি, ক্যালি আর্স প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা যায়। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

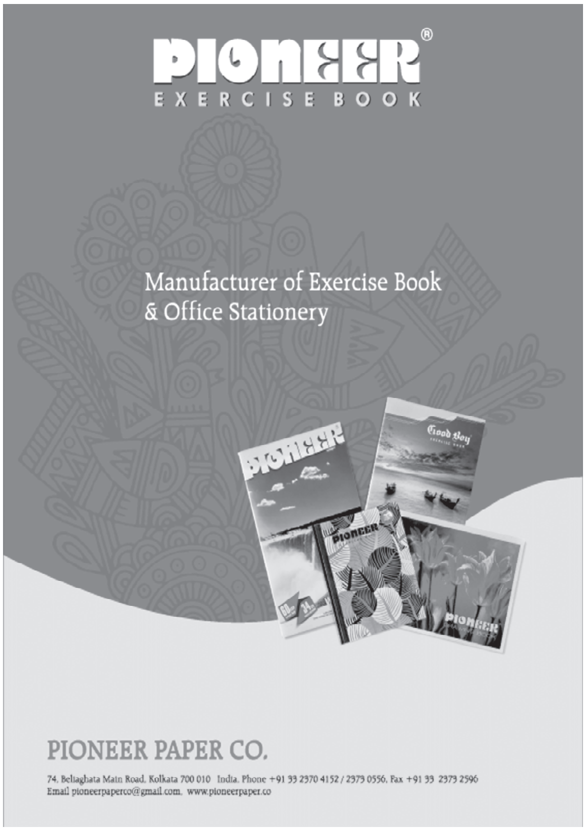

"বীরত্বের কাহিনিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে ভারতও অন্যতম। অতীত ইতিহাসের প্রত্যেক শিশুভোলানো কাহিনির মধ্যে আমরা ভারতের চারণ কবিদের গান এবং সাধারণ মানুষদের আনন্দকোলাহল শুনতে পাই। দক্ষিণ ভারতের রাত্রিকালের চেয়ে উত্তর ভারতের দীর্ঘস্থায়ী গোধূলিলগ্ন— এই অপূর্ব লোকসাহিত্য সৃজনে অধিকতর সহায়ক। বারান্দা বা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, যার একপাশে পর্দার আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসার স্থান নির্দিষ্ট থাকত, শীত ঋতুর কয়েক মাস অপরাহ্ণে সকালে সমবেত হতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্যটক কথক ঠাকুরকে ঘিরে তাঁর চমকপ্রদ কাহিনি শুনতেন।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সংস্কার ভারতীর নাটক—‘অলীক সুখ’

দীপ চক্রবর্তী ॥ গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় কলকাতায় আকাডেমিতে অভিনীত হলো সংস্কার ভারতীর এবারের নাটক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে ‘অলীক সুখ’। নাটক ও নির্দেশনা বিকাশ ভট্টাচার্য। মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি সুখ, আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে দৌড়তে থাকে। ভুলে যায় বাস্তব জীবনের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা। এই ভাবনারই প্রেক্ষাপটে নাটক ‘অলীক সুখ’। ডাঃ কিংশুক গুহ প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। বেশ কিছু নার্সিং হোম ও চেম্বারে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যুক্ত। আর তাঁর হাতে ঘটে গেল অঘটন। যখন তাঁরই সিজার করা প্রসূতি নার্সিং হোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তখন তিনি ব্যস্ত তাঁর স্ত্রীর জন্য, তাঁদের জীবনের প্রথম দেখা হওয়া দিনটিতে বিশেষ উপহার তুলে দেবার জন্য। স্ত্রীর পছন্দ করা নতুন ফ্ল্যাটের এগ্রিমেন্ট করতে। ফলস্বরূপ তাঁর অবর্তমানে প্রসূতির মৃত্যু। নাটকের শুরু এখান থেকেই। এরপর গল্প এগিয়েছে ডাঃ কিংশুক গুহের স্ত্রীর মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে নতুন ফ্ল্যাটের চাবি তার কাছে এসেছে, তারই মতো একটি মেয়ের প্রাণের বিনিময়ে। সেই সঙ্গে মানসিক ভাবে আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যখন তাঁর স্বামী জানায় নতুন ফ্ল্যাটে শুধু মাত্র তারা দুজনে যাবে, শ্বশুর-শাশুড়ি নয়।

ডাঃ কিংশুক গুহ'র ভূমিকায় সমর রায়ের অভিনয় সাবলীল। চরিত্রটিকে তাঁর অভিনয় গুণে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন মানসিক দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে নিজের কৃতকর্মকে সঠিক বলে প্রমাণিত করার প্রচেষ্টাকে। স্ত্রী রম্যাণির ভূমিকায় উপাসনা ব্যানার্জী সঠিক ভাবেই ফুটিয়ে তোলেন রম্যাণির মনকষ্টের যন্ত্রণাকে। বাবার চরিত্রে মদন মল্লিক ও মায়ের চরিত্রে স্বপ্না ব্যানার্জী চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ। প্রসূতি কবিতার ভূমিকায় দর্শকদের নজর কেড়েছেন সংহিতা পতি। কবিতার বোন নমিতার ভূমিকায় সুকুমার পতি নিজ নিজ চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন। ভোলানাথ ঘোষাল (ডাঃ দেবমাল্য), গোবিন্দ বসাক (মি. লাল), বিকাশ ভট্টাচার্য (ডাঃ দেবশঙ্কর মিত্র), হেনা দত্ত (সর্বাণী) স্বল্প পরিসরে নিজ নিজ অভিনয় ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে পিনাকী দত্ত, অজিত আচার্য, বিভাস নস্কর, শেলী বিশ্বাস, শুভাশিস লাহিড়ী, অনির্বাণ ব্যানার্জী স্ব স্ব ভূমিকায় যথাযথ।

বিকাশ ভট্টাচার্য গল্পের মূল সুরটি ধরে রেখে গল্পটির সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন, যাতে করে নাটকটি গতি পেয়েছে।

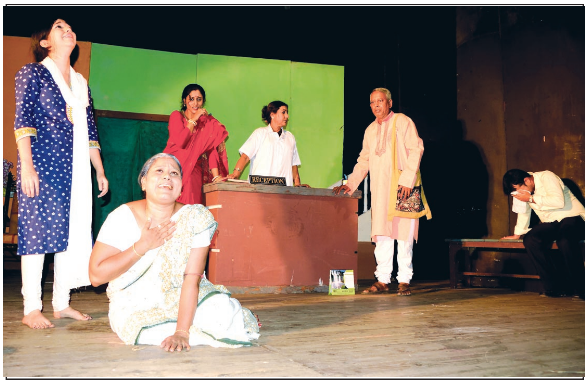

নাটকের একটি দৃশ্য

সেই সঙ্গে তিনি মঞ্চটিকে দুটি আলোক জোনে ভাগ করে ব্যবহার করেছেন নাটকের গতিকে ধরে রাখতে। আলোক সম্পাতে উত্তম বিশ্বাস, আবহে স্বপন কর্মকার, পোশাক বিন্যাস এবং মেকাপে মহম্মদ ইব্রাহিম যথাযথ। পরিশেষে বলতে হয়, এই নাটকের এটাই ছিল প্রথম মঞ্চায়ন। আশা করা যায়, অভিনেতারা পরবর্তী মঞ্চায়নে ছোটখাটো ভুলত্রুটিগুলিকে কাটিয়ে নিয়ে আরো ভালো নাটক দর্শকদের উপহার দেবেন। ■

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
বার্ষিক প্রশিক্ষণ বর্গ-২০১৭

দক্ষিণবঙ্গ-প্রবেশ

স্থান : ফিউচার জেমস্ আকাডেমি সাঁনজোয়া, বাঁবড়াহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
দিনাঙ্ক : ২১ মে থেকে ৫ জুন সকাল
শুল্ক : ৫৫০.০০ (পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা)

যোগাযোগ :
মৌসুমী দাস-৭০৫৯৭২

উত্তরবঙ্গ-প্রবোধ

স্থান : সারদা বিদ্যামন্দির (ইংরেজি মাধ্যম) রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর
দিনাঙ্ক : ১ জুন থেকে ১৬ জুন বিকাল
শুল্ক : ৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা)

যোগাযোগ :
জয়া সরকার-৮৬৭০১২০২০২
বন্দনা রায়-৯৮৫১১১৩২১৪
গরিমা ব্যাঙ্গানী-৯৬৭৯৮৬০৫৬৪

বন্ধু ময়না

বাড়ির ছোট্ট মেয়ে তুতুল। হাসিখুশি ভারী মিষ্টি মেয়ে। তার খেলার সঙ্গী বাড়ির পোষা ময়না। ময়না কথা বলে, গান গায়। স্কুল থেকে ফিরেই তুতুল দৌড়ে যায় ময়নার খাঁচার সামনে। ও দিদি, ও দিদি বলে চেঁচিয়ে ওঠে ময়না। ইস, গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তুতুল বাটিতে করে জল দেয়। ময়না জল খায়। তারপর দুজনেতে কত কথা বলে।

কদিন হলো পাশের বাড়ির হুলো বেড়াল ঘুর ঘুর করছে ময়নার খাঁচার কাছে। ময়না চেঁচিয়ে বলে— এই বেড়াল ভাগ, ভাগ। বেড়াল হিংস্র চোখে তাকায় ময়নার দিকে। তুতুলের বুক কেঁপে ওঠে। এই বেড়াল ভালো নয়। হিংসে করে ময়নাকে।

তুতুল মাকে বলে— মা, ওই বেড়ালকে তাড়াও। ও হিংসে করে আমার বন্ধু ময়নাকে।

যা, দূর হয়ে যা হতভাগা বেড়াল। মা লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়ালকে।

বিড়াল একলাফে পালায়। তারপর আর আসেনি। শান্ত হয় তুতুলের মন। যাক, ও আর কোনো ক্ষতি করবে না ময়নার।

তুতুলের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ময়না। ময়নাকে সব কথা বলে। ময়না মন দিয়ে শোনে তার কথা। একদিন তুতুল ময়নাকে বলে— ময়না, তুমি শুধু আমার কথা শোন কিন্তু নিজের কথা বলো না কেন? আজ তুমি নিজের কথা বলো।

ময়না বলে— কেউ যে আমার কথা শুনতে চায় না। তবে আমি কী করে বলি?

ক'দিন বাদে এলো তুতুলের জন্মদিন। বাড়িময় আনন্দ। দিদা দিয়েছে নতুন জামা। বাবা এনেছে নতুন খেলনা। মা রান্না করেছে কত কী! ময়না সুর করে বলেছে, শুভ জন্মদিন, শুভ জন্মদিন। তুতুলের তবু মন খারাপ। বাবা জিজ্ঞেস করলো— সোনামণির মন খারাপ কেন?

তুতুল অভিমানী স্বরে বলে— আমার ময়নার জন্মদিন কবে?

বাবা বলে— আজই তো! দেখো ময়নার জন্যও এনেছি নতুন উপহার। সুন্দর নতুন একটি খাঁচা।

তুতুল এবার ফুঁপিয়ে কাঁদে। বলে— না, ওর চাই না কোনো উপহার। আমারও চাই না কোনো উপহার। তুমি ওকে মুক্ত করে দাও। আমি পড়ার টেবিলে বই পড়বো ও গাছের ডালে বসে গান গাইবে। কথা বলবে আমার সঙ্গে। বাবা তুতুলকে বোঝায়, ময়না বনের পাখি। ওকে ছেড়ে দিলে ও-যে বনেই উড়ে যাবে। কথা বলবে না কারো সঙ্গে।

তুতুল তবু শোনে না বাবার কথা। ময়নাকে ছেড়ে দিতেই হবে, জেদ তার। বাবার মন বড় নরম। তুতুলের কান্না দেখে কষ্ট পায়। খুলে দেয় খাঁচা। প্রথমবার মুক্তির স্বাদ পায় ময়না। দুটি পাখা মেলে উড়ে যায় আকাশে।

তিনদিন কেটে গেল। ময়না ফিরলো না। তুতুলের ভারী অভিমান। ময়না এতো খারাপ। মুক্ত হয়ে বন্ধুর কথা ভুলে গেল! বাবা বললেন— আরও একটি ময়না এনে দেবো। কিন্তু তুতুলের চাই না আর অন্যকোনো ময়না। অনেকদিন কেটে গেছে। তুতুলের নতুন শুরু ক্লাস হয়েছে। বন্ধু হয়েছে নতুন। একদিন সকালবেলা পড়ার টেবিলে বসে পড়ছে তুতুল। ঝলমলে রোদ উঠেছে। জানলার ওপারে গাছে কত পাখির কিচিরমিচির। তুতুল হঠাৎ শোনে একটি চেনা পাখির ডাক— ও দিদি, ও দিদি।

ময়না ফিরে এসেছে। আনন্দে কেঁদে ফেলল তুতুল। ময়না উড়ে এসে তার কাঁধে বসলো।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

মাহিষ্মতী

প্রাচীন ভারতের একটি প্রাচীন নগর জনপদ মাহিষ্মতী। ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে নর্মদার তীরে গড়ে ওঠে এই জনপদ। পরবর্তীকালে অবন্তী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অবস্থানগত ভাবে এটি উজ্জয়িনীর দক্ষিণে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহিষ্মতী সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছয়। মাহিষ্মতীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা। সেই সময়ের রচিত কাব্যগুলিতে মাহিষ্মতীর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত, পালি, তেলুগু ভাষা চর্চার কেন্দ্র ছিল এই জনপদ। সম্প্রতি মাহিষ্মতী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে 'বাহুবলী' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন চিত্র পরিচালক এস এস রাজামৌলি। যেখানে মাহিষ্মতীর প্রাচুর্য ও মহত্ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে।

এসো সংস্কৃত শিখি

किमर्थम् अत्र आगमनम्?

এখানে কী কারণে আগমন?

अत्रैव किञ्चित् कार्यम् आसीत्।

এখানে কিছু কাজ ছিল।

त्वरितं कार्यम् आसीत्। अत: आगतवान्।

কিছু জরুরি কাজ ছিল। তাই এসেছি।

बहुकालत: प्रतीक्षां करोमि।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।

यानं न प्राप्तं, अत: एव विलम्ब:।

গাড়ি পাইনি, তাই এত দেরি।

ভালো কথা

পাখিদের জন্য জল

গরমে সবারই হাঁসফাঁস অবস্থা। মানুষের থেকে বেশি কষ্ট পশু-পাখির। কারণ মানুষের তেষ্টা পেলে নিজে নিজে জল নিয়ে খেতে পারে, কিন্তু পশু-পাখিদের জলের সন্ধান করতে হয়। দুপুরবেলা দেখা যায় কত পাখি একটু জলের আশায় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে একটু জল পায় সেখানে উড়ে যায়। তাই সবার উচিত বাগানে, বাড়ির ছাদে কোনো পাত্রে একটু জল রেখে দেওয়া। যাতে পাখিরা সেখানে এসে জল খেতে পারে। আমাদের বাড়ির ছাদে একটি ছোট্ট বাগান আছে, সেখানে নানা রকমের গাছ আছে। গাছে জল দেওয়ার সময় আমরা প্রতিদিন একটি পাত্রে জল রেখে দেই। দুপুরবেলা পাখিরা এসে জল খেয়ে যায়। পাখিদের সেই জল খাওয়ার দৃশ্য দেখে মন আনন্দে ভরে যায়।

জয়শ্রী দেবশর্মা, সপ্তম শ্রেণী, শিবপুর, হাওড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) রা ণু রে প

(২) ক ল্পি ত হ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ম দ্যা রূ ন

(২) ভূ ত মি ট

১ মে সংখ্যার উত্তর

(১) সম্পাদকীয় (২) পর্যালোচনা

১ মে সংখ্যার উত্তর

(১) বুনোহাঁস (২) বিসর্জন

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ি, বীরভূম (২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর (৩) সায়ণ দাশ, খাতড়া, বাঁকুড়া (৪) ঋতম চ্যাটার্জী হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SURYA FOUNDATION

Tel. : 011-25262994, 25253681 Website : www.suryafoundation.net.in

Surya Foundation is a renowned organisation for imparting training to the youth for their all-round development. We require dedicated & diligent young boys brought up in a sound SANGH culture with impeccable character and devotion to social work for the following categories :

1. **CA, Engineers (IIT, NIT and Regional Engineering Colleges), MBA**

Age 20-23 years. Prior to the final posting, 3 months initial training at **Surya Training Centre** followed by one year On Job Training (OJT) / Practical Campus Training (PCT) will be imparted. Stipend and salaries will be as under :—

Post	Experience	Initial Training + OJT / PCT	After Training CTC
CA	Fresher	40,000 - 50,000	As per performance
	5 years	60,000 - 75,000	- do -
	10 years & above	80,000 - 1,00,000	- do -
Engineer	B.Tech. (IIT)	50,000	- do -
	B.Tech. (NIT)	35,000	- do -
	B.Tech.	20,000 - 25,000	- do -
MBA		15,000 - 20,000	- do -
Mass Communication (Media)		20,000 - 25,000	- do -
MCA, M.Sc., M.Com., M.A.		20,000 - 25,000	- do -
B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store		15,000	- do -
B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com.		8,000	- do -

2. **Graduate Management Trainee (GMT)**

Qualifications. Boys who have passed class 10th or 11th or 12th may apply. Should have secured minimum 60% aggregate marks with 75% marks in Maths in the previous class.

Age. Below 18 years. Selected candidates will be imparted 6 months initial training at Surya Foundation Training Campus Jhinjholi prior to the OJT/PCT. **Facilities for doing graduation and MBA/MCA will be provided during OJT / PCT.**

Free accommodation, food and stipend of Rs. 3,000/- p.m. will be provided during the period of 6 months initial training.

During the OJT / PCT, besides free accommodation and facilities for education, **stipend of Rs. 6,000/- p.m. in class 11th, Rs. 7,000/- in class 12th, Rs. 9,000/- in 1st year graduation, Rs. 10,500/- in 2nd year graduation, Rs. 12,000/- in 3rd year graduation, Rs. 15,000/- during MBA / MCA 1st year and 20,000/- in MBA / MCA 2nd year will be given. Salary Rs. 30,000/- p.m. (CTC) will be given on completion of MCA / MCA.**

3. **Assistant Staff Cadre (ASC)**

Qualifications. Boys who have passed class 10th or 11th or 12th may apply. Should have secured minimum 55% aggregate marks with 60% marks in Maths in the previous class.

Age. Below 18 years. Selected candidates will be imparted 6 months initial training at Surya Foundation Training Centre Jhinjholi prior to OJT / PCT for three years.

Free accommodation, food and a stipend of Rs. 3,000/- p.m. will be provided during the six months initial training.

During the OJT / PCT, besides free accommodation **stipend Rs. 6,000/- p.m. for 1st year, Rs. 7,000/- p.m. for 2nd year and Rs. 8,000/- p.m.** for 3rd year will be paid.

On completion of OJT / PCT salary of Rs. 11,000/- (CTC) will be given.

Application Form
Apply on a separate sheet of paper)

Affix latest Photograph here

Category 1 / 2 / 3 (Indicate the category applied for)

Full Name (In Capital) __________ Date of Birth _________ Caste _______ Married / Single _______

Father's Name ___________________________ Father's Occupation ________ Monthly Salary _____

Brothers (Excluding Self) _______ Sisters ________________

Educational Qualification________________________________ (Attach Photocopy of Marksheet)

Have you attended NCC/NSS/OTC/ITC/Sheet Shivir? Give Details of location of Camp and dates __________________

Were you associated with Seva Bharati / Vidya Bharati / Vanvasi Kalyan Ashram / Any other Sangh Project? Give details.

Is anyone known to you in Surya Family? Give his name and department _____________________________________

Have you ever been Interviewed in Surya Foundation? If yes, give Year and Cadre for which Interviewed. ____________

Address for Correspondence _________ Pincode ______ Phone No. __________ Mobile __________ Email ________

Give details of any special achievements, qualifications etc.

Apply with detailed biodata at the following address. Applicants for 'Category 1' should also send their detailed CV along with the application.

Apply within one month of the publication of the advertisement

বর্ষপ্রতিপদে জয়দেব খণ্ডের রক্তদান শিবির

গত ২৮ মার্চ বর্ষপ্রতিপদের দিন দক্ষিণ বীরভূম জেলার জয়দেব খণ্ডে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। খণ্ডের সমস্ত মণ্ডল থেকে ২০০ জন স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও মা-বোন রক্তদান করতে উপস্থিত হন। ৭০ জন কার্যকর্তা, স্বয়ংসেবক এবং ৪ জন মা-বোন রক্তদান করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রবীণ প্রচারক হরিসাধন কোনার। শিবিরে উপস্থিত রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন বীরভূম বিভাগ প্রচারক উত্তম মণ্ডল, জেলা কার্যবাহ সুপ্রিয় চ্যাটার্জী-সহ প্রচার প্রমুখ পার্থসারথি সাধু। শিবির পরিচালনা করেন বীরভূম জেলা সেবা ট্রাস্টের কার্যকর্তারা।

প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সংবর্ধনা

গত ১ মে মেদিনীপুর জেলার খড়খুশমা গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। ১৯৭৮ সালে ওই অঞ্চলের শাখার কাজ শুরু হয় তাঁর হাত ধরেই। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৫। সেই সময় পাশাপাশি ১৫টি গ্রামে শাখা চলত। 'মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী'-র পক্ষ থেকে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বেশ কয়েকটি গ্রামের স্বয়ংসেবক, শুভানুধ্যায়ী ও মা-বোন- সহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঘোষকে মাল্যদান করে বস্ত্র ও সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। মেদিনীপুর থেকে বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁইয়া, লহর মজুমদার, ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ তিলক বেরা, জেলা সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারী-সহ ৩২ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই উল্লেখ করেন যে তিনি সঙ্ঘ অন্ত প্রাণ ছিলেন। রাজনৈতিক বহু বাধা অতিক্রম করে সঙ্ঘের কাজ করেছেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রায় দু' ঘণ্টার অনুষ্ঠান হয়। এলাকার প্রথম বিস্তারক বর্তমানে প্রজ্ঞাপ্রবাহের ক্ষেত্রীয় প্রচারক অরবিন্দ দাশ উপস্থিত ছিলেন।

যাদবপুর স্বাস্থ্য শিবিরে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার

বিজেপির যাদবপুর পশ্চিম মণ্ডলের উদ্যোগে গত ১৬ এপ্রিল সকালে রিজেন্ট এস্টেটের পার্টি কার্যালয়ে একটি অভিনব স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের উদ্‌বোধন করেন রাজ্য যুবমোর্চার সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ। কলকাতা দক্ষিণ শহরতলি জেলা সভাপতি সোমনাথ ব্যানার্জী-সহ রাজ্য এবং জেলার বিভিন্ন নেতা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, চক্ষুপরীক্ষা, শিশু এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-সহ রক্তদানের (সরাসরি) অঙ্গীকার, মরণোত্তর দেহ এবং চক্ষুদানের অঙ্গীকার, ক্যান্‌সার সচেতনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের ডাঃ সোমনাথ সরকার ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ডাঃ অরিন্দম ব্যানার্জী (শিশু), ডাঃ প্রবীর মুখার্জী (হোমিও),ডাঃ হিমানীশ চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক শিবিরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মণ্ডল সভাপতি সন্দীপ পাণ্ডে জানান, এদিন ১২ জন দেহদান, ৬ জন চক্ষুদান, ৯৬ জন রক্তদানের অঙ্গীকার করেন। শিবিরে সক্রিয় সহযোগিতা করেন 'শুভ ডায়োগনস্টিক।'

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক হনুমানমল বোড়াড়

গত ১৩ এপ্রিল মধ্যরাত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা হনুমানমলজী বোড়াড় কিডনিজনিত অসুস্থতার কারণে ৮৫ বৎসর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম রাজস্থানের লাডনু-নাগোরে ১৯৩২ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি, তিনি ছিলেন আবাল্য স্বয়ংসেবক। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে কলকাতায় আসেন। পরবর্তীকালে নিজস্ব ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে অসমের জিনজিয়া টি এস্টেট এবং পরে ১৯৫৬ সালে কলকাতায় ফিরে শুরু করেন রেডিমেড গার্মেন্টের ব্যবসা। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচুর সময় দিয়ে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতায় মণ্ডল কার্যবাহ, নগর কার্যবাহ, ভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ, মহানগর ব্যবস্থা প্রমুখ এবং পরিশেষে প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ রূপে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও একাত্মতা যজ্ঞ, রামজ্যোতি রথ, রামশীলা পূজনের মতো বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সর্বোপরি মোরভির বন্যা, অন্ধ্রপ্রদেশের ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, আয়লা, নেপালের ভূমিকম্পের মতো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে কিংবা বিবেকানন্দ যুব শিবিরের ন্যায় বৃহৎ কোনো কার্যক্রমকে সফল করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি যেভাবে হাসিমুখে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন তা আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে প্রেরণাদায়ী। পরিশেষে যে বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য সেটি হলো তাঁর যে গ্রামের পারিবারিক ধর্মশালা সেটা তিনি অনাথালয় ও বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত করেন। রাজস্থানে নিজস্ব আদর্শ বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে তাঁরই ঐকান্তিক প্রয়াস। পত্নি বিয়োগ তাঁর

বহুপূর্বেই হয়। বর্তমানে তিনি একপুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতনি, অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং আত্মীয় পরিবার পরিজনদের রেখে গেছেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা— তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

পরলোকে ড. বলরাম চক্রবর্তী

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির (পশ্চিমবঙ্গ) প্রাক্তন সভাপতি ড. বলরাম চক্রবর্তী গত ৩০ এপ্রিল নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীঘদিন তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। তিনি রেখেছেন স্ত্রী ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব। বলরামবাবু পৃথিবী বিখ্যাত নতৃত্ত্ববিদ ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সেমিনারে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট সুপণ্ডিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের একসময় উপদেষ্টা পদে বৃত ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ড. চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। একসময় তিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীতে অফিসার পদেও কর্মরত ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি সেইসব দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির উপস্থিতি, আত্মিক যোগাযোগ ও রক্তের সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের নৃতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এই বিষয়ের উপরও গবেষণা করে বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। তিনি ধনুর্বিদ্যা, বাংলার সেনবংশের উপর গবেষণা, তন্ত্রবিষয়ক গবেষণা, নাথযোগী সম্প্রদায়ের উপর গবেষণামূলক বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর সঙ্গে স্বস্তিকার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ২০১৬ সালে স্বস্তিকা আয়োজিত এক সেমিনারেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

গত ১৭ এপ্রিল মেদিনীপুর বক্সীবাজার শিশু মন্দিরের আচার্যা সুশ্রী গঙ্গা সরকার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি শিশুদের বিকাশের মাধ্যমে দেশ সেবার কাজ করে গেছেন। তিনি প্রান্তের সমিতি তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে তাঁর বাড়ির সঙ্গে আমরা শিশু মন্দির পরিবারও মর্মাহত। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

* * *

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম পুরসভার স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি রাকেশ সিংহ-র মাতৃদেবী আরতি সিংহ গত ২৭ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যবস্থা প্রমুখ বুনিয়াদপুর শাখার স্বয়ংসেবক আলিগাড়া নিবাসী প্রদীপ কর্মকারের মাতৃদেবী বাসুদেবী কর্মকার গত ১২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ পুত্র, ৪ পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শাখার স্বয়ংসেবক থিঙ্গুর নিবাসী নির্মল সরকারের পিতৃদেব নিমাই সরকার গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

দ্বারহাট্টা গ্রামের স্বয়ংসেবক সুকুমার সেন তাঁর পুত্র দীপায়নের শুভ অন্নপ্রাশনে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন দ্বারহাট্টার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অদ্বৈতনাথ দে-র হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপন ভড়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিনাজপুর বিভাগ শারীরিক প্রমুখ বংশীহারী খণ্ডের বদলপুর শাখার স্বয়ংসেবক মৃণালকান্তি মণ্ডল তার দ্বিতীয় পুত্র গৈরিক মণ্ডলের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সমাজসেবার জন্য মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন তিনটি খণ্ড ও নগর প্রচারক অনুকূল মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা ও খণ্ড স্তরের কার্যকর্তা-সহ বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৪ এপ্রিল বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সংহিতার শুভ বিবাহ উপলক্ষে তাঁর দাদা নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্তের হাতে। জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৭ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডের রাধাকৃষ্ণপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা তাম্রলিপ্ত জেলা প্রচারক কাজল মণ্ডলের ভাইপো সুরজিত মণ্ডলের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা শক্তিপদ মণ্ডল মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহের হাতে। অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
15 May - 2017 - Rs. 10.00,

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।